বিষণ্নতা ও একাকিত্ব ঃ সচেতনতা ও করণীয়

বিষণ্নতা ও একাকিত্ব একটি ভয়াবহ মানসিক রোগ। বিষণ্নতা একটি বৈশ্বিক মানসিক রোগ। বাংলাদেশেও এই রোগ দ্রুতই বিস্তার লাভ করছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশেও এ রোগ অবিশ্বাস্যভাবে বেড়েই চলছে, যা কি না গোটা জনসমাজকে ভাবিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। আমাদের দেশ কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে ভরপুর। এ দেশে মানসিক রোগ যেন অবহেলার বস্তু। এ দেশে মানসিক রোগী মানে তথাকথিত পাগল। মানসিক রোগকে এ দেশের মানুষ যেন স্বীকারই করতে চায় না। মনোব্যাধি হলে লোকে মনে করেন জিনে ধরেছে, নয়তো পরী ধরেছে অথবা কোনো খারাপ-আত্মা বা ভূত-প্রেত আসর করেছে। এ ধরনের অযৌক্তিক ভাবনা ও চিন্তাধারা রোগীকে করে তোলে অসহায়। আর রোগীর অসহায়ত্বকে আরও মানসিকভাবে করে তোলে বিপর্যস্ত। তবে এখন দিন কিছুটা হলেও পাল্টাতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষ মানসিক রোগের কথা জানতে পারছে এবং কিছুটা হলেও সচেতন হচ্ছে।

বিষণ্নতা ও একাকিত্ব কী?

ইমোশনাল ইলনেস এবং এ রোগে ব্যক্তির মন-মেজাজ বা মুডের অবনতি ঘটে দারুণভাবে। বিষণ্নতা একটি আবেগজনিত মানসিক সমস্যা। দুঃখবোধের মতো সাধারণ আবেগ যখন অযৌক্তিক, তীব্র ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোনো ব্যক্তিকে ঘিরে থেকে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন, কর্মতৎপরতা ও পারস্পরিক সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করে, তখন সেটাকে বলা হয় বিষণ্নতা। এতে মস্তিষ্কের সেরোটনিন' জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের গুণগত ও পরিমাণগত তারতম্য ঘটে। যে কেউ যে কোনো সময় এতে আক্রান্ত হতে পারে। ধর্ম-বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, কেউই বিষণ্নতা থেকে ঝুঁকিমুক্ত নয়। তবে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় দ্বিগুণ।

কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিষণ্নতা' বা ডিপ্রেশন' বলতে যা বোঝায়, তা সাধারণ মন খারাপের চেয়ে কিছু বেশি। বিষণ্নতার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। শরীর ও মনের ভেতর থেকে এই এন্ডোজেনাস' বিষণ্নতার উৎপত্তি। আবার কখনো বিভিন্ন ব্যক্তিগত বা সামাজিক কারণে সৃষ্ট দুঃখবোধ যদি অযৌক্তিকভাবে বেশি তীব্র ও দীর্ঘ সময় বিরাজমান থাকে, তখন তাকে বলে রিঅ্যাকটিভ' বিষণ্নতা। মানুষের বিষণ্নতার ফলে তৈরি হয় একাকিত্ব, যা মানুষের জীবনকে করে আরও অসহায়।

বিষণ্নতা ও একাকিত্ব এবং ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাপনের মান কমে যাওয়ার ওপর ভিত্তি করে একে গুরুতর, মাঝারি ও মৃদু এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ডিপ্রেশন বিভিন্ন ফর্মে আবির্ভূত হয়ে থাকে। যেমন-অনিদ্রা ব্যক্তির মধ্যে দিনের পর দিন সঙ্ঘটিত হতে থাকে। ৬৫ বছরের অধিক বয়সের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা অন্যদের চেয়ে চার গুণ বেশি ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয় বা ভুগে থাকে। ডিপ্রেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা।

বিষণ্নতা ও একাকিত্বের কারণ বা লক্ষণগুলো কী কী ?

নগরায়ণ, শিল্পায়ন, নৈতিকতা ও দর্শনের পরিবর্তন, সহিংসতা, অভিবাসন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বিশ্বব্যাপী বিষণ্নতার হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিষণ্নতা ও একাকিত্ব, যা মন

খারাপের চেয়েও একটু বিশেষ কিছু। দিন দিন সারা বিশ্বে এই সমস্যা বাড়ছে। বাংলাদেশেও এই রোগ বর্তমানে বেড়েই চলছে। প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন তাদের জীবনে কখনো না কখনো ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন। ২ শতাংশ এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রায় ৫ শতাংশ ডিপ্রেশনে ভুগে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শতকরা ৪ দশমিক ৬ শতাংশ নারী-পুরুষের বিষণ্নতা রয়েছে। যে কোনো বয়সে এমনকি শিশুদের মধ্যেও এটি দেখা দিতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সে বিষণ্নতার লক্ষণ প্রথমবারের মতো দেখা যায়। এছাড়া ১৫ থেকে ১৮ বছর ও ৬০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে এর ঝুঁকি কিছুটা বেশি।

বিষণ্নতায় সাধারণ লক্ষণগুলো সমূহ ঃ

কমপক্ষে দুই সপ্তাহ জুড়ে দিনের বেশির ভাগ সময় মন খারাপ থাকা, কোনো কিছু করতে ভালো না লাগা, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, হঠাৎ রেগে যাওয়া, আগে যেসব কাজ বা বিনোদন করতে ভালো লাগত এখন সেগুলো ভালো না লাগা, মনোযোগ কমে যাওয়া, ক্লান্তিবোধ করা, ঘুমের সমস্যা (যেমন-খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয় বা ঘুম না হওয়া অথবা বেশি ঘুম হওয়া), রুচির সমস্যা (যেমন-খেতে ইচ্ছে না করা, খিদে না থাকা বা বেশি বেশি খাওয়া), যৌনস্পৃহা কমে যাওয়া, মনোযোগ কমে যাওয়া, সাধারণ বিষয় ভুলে যাওয়া, সবসময় মৃত্যুর চিন্তা করা, নিজেকে অপরাধী ভাবা, আত্মহত্যার চিন্তা ও চেষ্টা করা ইত্যাকার মানসিক দিক। এছাড়া কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না-এমন কিছু শারীরিক সমস্যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়; বিশেষত নারী রোগীদের মধ্যে, যেমনঃ মাথাব্যথা, মাথায় অস্বস্তি, মাথা-শরীর-হাত-পা জ্বালা করা, গলার কাছে কিছু আটকে থাকা, শরীরব্যথা, ঘাড়ব্যথা, গিঁটে গিঁটে ব্যথা, বুক জ্বালা,

বুকব্যথা, নিঃশ্বাসে কষ্ট বা এ ধরনের রোগের লক্ষণ। কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এসব শারীরিক সমস্যার কারণ পাওয়া যায় না।

বিষন্নতার ৫ টি লক্ষণ

১। **মন খারাপ করে থাকা:** বিষণ্নতা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় মন খারাপ করে থাকে। যেন পৃথিবীতে মন ভালো করার মতো কোনো কিছুই নেই। তাকে দেখলেই মনে হবে কোনো কারণে তার প্রচণ্ড মন খারাপ। কোনো খুশির সংবাদেও তাকে খুব একটা সুখী হতে দেখা যায় না।

২। **অনাগ্রহ:** সবকিছুতেই অনাগ্রহ বিষণ্নতা রোগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। রোগী চমৎকার সব আগ্রহের জিনিসের প্রতিও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। চমৎকার উপন্যাস, ভালো সিনেমা, এমন কি কোথাও বেড়াতে যাওয়ার প্রতিও তার কোনো আগ্রহ থাকে না।

৩। **নিজেকে অকর্মণ্য ভাবা:** বিষণ্নতা আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় নিজেকে ব্যর্থ মানুষ হিসেবে মনে করে। চারপাশের মানুষকে সফল এবং কর্মঠ, কিন্তু নিজেকে মনে করে কোনো কাজের জন্যই সে পারফেক্ট না। ভোগে হতাশায়।

৪। **অমনোযোগী হয়ে ওঠা:** পৃথিবীর কোনো কিছুতেই সুষ্ঠু মনোযোগ দিতে পারে না বিষণ্নতায় আক্রান্ত ব্যক্তি। তার অমনোযোগিতার কারণে নানা রকম সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে তবু তার টনক নড়ে না। সে নিজেও জানে না, তার মন কোন্ দিকে নিবিষ্ট।

৫। **সবসময় মৃত্যুর কথা চিন্তা করা:** না, বিষণ্নতায় আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় পায় না। সে সবসময় ভাবে কখন তার মৃত্যু হবে, যেন মৃত্যু হলেই সে তার জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করবে। কথায় কথায় সে মৃত্যুর কথা বলবে আর পথ খুঁজবে সহজেই কীভাবে মরে যাওয়া যায়।

নিজের কিংবা পরিচিত কারো মাঝে যদি এই সব লক্ষণ দেখা যায়, তবে অবশ্যই মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সঠিক চিকিৎসায় এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। দেখবেন, পৃথিবী আবার সুন্দর হয়ে উঠবে, বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে ভীষণ।

বিষণ্নতা ও একাকিত্ব থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ঃ

বিষণ্নতার ও একাকিত্বের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রাতারাতি বিষণ্নতামুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ধৈর্য্য ধরতে হবে। মনোরোগ চিকিৎসককে সময় দিতে হবে। বিষণ্নতার মতো মানসিক সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ইতিবাচক মানসিকতা। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে

আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ও যুক্তি দিয়ে নিজের মানসিক অবস্থাকে মূল্যায়ন করতে পারাটাই সবচেয়ে শ্রেয়। চিকিৎসকের শরণাপন্ন তখনই হওয়া ভালো, যখন নিজের নিয়ন্ত্রণটা আর নিজের আয়ত্ত্বে থাকে না।

- **প্রতিরোধই উত্তম ঃ** একটু সময় নিয়ে নিজের মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করা। নিজেকে জানা। কোন্ বিষয়গুলো বিষণ্নতায় তলিয়ে দিচ্ছে, তা ভাবো। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে দূরে থাকা, সুষম ডায়েট অনুসরণ করা, এগুলো বিষণ্নতা প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায়।
- **শরীরচর্চা ঃ** একটি ভালো ব্যায়াম ক্লাব বা জিমে ভর্তি হয়ে কিংবা বাড়িতে ও পার্কে নিয়মিত শরীরচর্চা করা। একজন সুদক্ষ ব্যায়াম প্রশিক্ষকের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া। হাঁটা, জগিং, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটাও বেশ ভালো ব্যায়াম। তবে বয়সভেদে ব্যায়ামের ধরন ভিন্ন।
- **সুষম ডায়েট অনুসরণ ঃ** অনেকেই আছেন যারা শরীর থেকে অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে স্লিম হতে চান। আর সে লক্ষে নিজের ইচ্ছামতো ডায়েট মেনে চলে। আর, খাওয়া-দাওয়া অনেকটা কমিয়ে নানা রোগ বাধিয়ে বসে। কিন্তু, এটা কখনো হয়তো ভাবে না যে, কম বা বেশি নয় বরং পরিমিত মাত্রায় পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। তাই প্রথমে একটি সুষম ডায়েট চার্ট করে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।
- **পর্যাপ্ত ঘুম ঃ** হতাশা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ঘুমের সময়ে তারতম্য হতে পারে। কেউ হয়তো বেশি ঘুমায়, কেউ কম। কেউ কেউ অনিদ্রার সমস্যায় ভোগে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে, ৭ থেকে ৮ ঘণ্টার

বেশি ঘুম নয়। আবার কমও নয়। এটা মাথায় রাখা। ভালো ঘুম বা সুনিদ্রার বিকল্প নেই। তাই ঘুম নিয়ে পত্র-পত্রিকা, বই ও ইন্টারনেটে লেখা বিভিন্ন তথ্য অনুসরণ করা।

- **প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকা ঃ** শহরে থাকলে সুনির্মল প্রকৃতির সংস্পর্শ পাওয়াটা বেশ কঠিন। তারপরও আশপাশে বড় বা ভালো কোনো পার্ক থাকলে ভোরে ঘুম থেকে উঠে সেখানে চলে যাওয়া। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট এভাবে সময় ব্যয় করা। নিজের বাগান থাকলে সেখানে সময় কাটানো। এতে একঘেয়েমি কাটবে। শরীর ও মন ঝরঝরে ও স্বতঃস্ফূর্ত হবে।
- **সৃজনশীলতা ঃ** নিজের চিন্তাধারাকে আরও বেশি সৃজনশীল করে তোলা। প্রত্যেকেরই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত কিছু অসাধারণ গুণাবলি রয়েছে। নিজের মধ্যে সেগুলো আবিষ্কার করা ও কাজে লাগানো। নিজের হাতে কিছু করা। ছবি তোলা বা ভিডিও করা, ছবি আঁকা, ছড়া-কবিতা, গল্প বা ডায়েরি লেখা বা এসবের মধ্যে নিজেকে দিনের কিছুটা সময় ব্যস্ত রাখা।
- **বই পড়ো ঃ** লাইব্রেরি বা পাঠাগারে গিয়ে কিছুটা সময় কাটানো। খবরের কাগজ বা বই এখন ইন্টারনেটেই পড়া যায়। তা সত্ত্বেও কাগজের পাতা উল্টে বই পড়ার আনন্দ পেতে কিছু বই সংগ্রহ করা মন্দ নয়। ধর্মীয় বই পড়লেও মনে প্রশান্তি আসবে।
- **মানুষের উপকার করা ঃ** অন্য মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। প্রতিদিন অন্তত একজন মানুষের উপকার করা। দুঃস্থ, অসহায় কোনো মানুষের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো ও তাকে সাহায্য করা । তার অবস্থা মন থেকে বোঝার চেষ্টা করা। দেখবে প্রশান্তিতে মন ভরে গেছে।
- **সমস্যার কথা শেয়ার করা ঃ** খুব কাছের কয়েকজনের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে নিজের সমস্যার কথাগুলো মন খুলে বলা। সমস্যাগুলো থেকে সমাধানের উপায় খুঁজতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা । এতে একদিকে যেমন সমাধান বের হয়ে আসবে, অন্যদিকে অনেক বেশি হালকা অনুভব হবে।
- **বন্ধুকে পাশে রাখা ঃ** বিষণ্নতার সময় অনেকে এতটা বেশি নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলে, যা তাকে আরও ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। একাকিত্বকে নিজের করে নিয়ে নিঃসঙ্গ থাকা বোকাদের কাজ। তাই দুঃসময়ে বন্ধুদের পাশে রাখা উত্তম।

একাকিত্ব বিষয়টিকে যত বেশি প্রশ্রয় দেবে এটি তত বেশি গ্রাস করতে থাকবে। তাই কোনোভাবেই এটিকে পাত্তা দেয়া যাবে না। সবসময় সবার সাথে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করো। তাই কোনোভাবেই মন খারাপ রাখা চলবে না। প্রথমে মন খারাপের কারণটি খুঁজে বের করতে হবে এবং তা সমাধানের চেষ্টা করবে।

ফিস্টুলা ঃ কারন, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

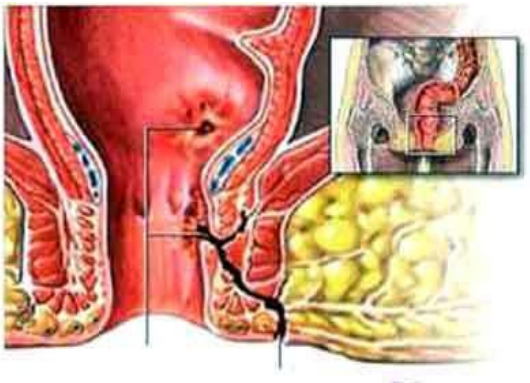

ফিস্টুলা বা ভগন্দর পায়ুপথের একটি রোগ। রোগটির জন্ম হয় মলদ্বারের বিশেষ ধরনের সংক্রমণের কারণে। মলদ্বারের ভেতরে অনেক গ্রন্থি রয়েছে। এগুলোর সংক্রমণের কারণে ফোঁড়া হয়। একসময় এই ফোঁড়া পেঁকে যায় এবং ফেটে গিয়ে মলদ্বারের চতুর্দিকের কোনো এক স্থানের একটি ছিদ্র দিয়ে পুঁজ নির্গত হতে থাকে। মলদ্বারের আশেপাশের কোনো স্থানে এক বা একাধিক মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে পুঁজ বের হয়ে আসাকে ফিস্টুলা বা ভগন্দর বলা হয়। মলদ্বারের ক্যান্সার এবং বৃহদান্ত্রের প্রদাহজনিত রোগেও ফিস্টুলা হয়ে থাকে। মলদ্বারের ক্ষতের কারণেও ফিস্টুলা হতে পারে।

ফিস্টুলার প্রকারভেদ ঃ

এটিকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

- সাধারণ
- মাঝারি জটিল
- অত্যন্ত জটিল।

সাধারণ ফিস্টুলা ঃ এটি মলদ্বারের মাংসপেশির খুব গভীরে প্রবেশ করে না বিধায় চিকিৎসা সহজসাধ্য।

জটিল ফিস্টুলা ঃ এর বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে এবং তা নির্ভর করে এর নালিটি মলদ্বারের মাংসের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে এবং কতটা পথ পাড়ি দিয়ে এটি বাইরের মুখ পর্যন্ত এসেছে। এগুলোর চিকিৎসা সত্যিই দুঃসাধ্য। তারপর যদি এ নালি একের অধিক হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। এ রোগের অপারেশনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো সঠিকভাবে অপারেশন সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে রোগী মল আটকে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

ফিস্টুলার লক্ষণ ঃ

ফিস্টুলা বা ভগন্দর রোগের লক্ষণ মূলত তিনটি-

- মলদ্বার ফুলে যাওয়া
- মলদ্বার ব্যথা হওয়া
- পুঁজ বা আঠালো পদার্থ বের হওয়া
- এছাড়া ক্ষতস্থানে সবসময় অস্বস্থি আরও একটা প্রধান লক্ষণ

ফিস্টুলা পরীক্ষা ঃ

রোগ নির্ণয়ের জন্য বেশ ক'য়েকটি পরীক্ষা করা হয়। যেমন-

- প্রক্টস্কপি, সিগময়ডস্কপি
- কোলনস্কপি
- বেরিয়াম এক্স-রে
- ফিস্টুলো গ্রাম
- এনাল এন্ডোসনোগ্রাফি

ফিস্টুলার চিকিৎসা ঃ

সার্জারিই ফিস্টুলার একমাত্র চিকিৎসা। অপারেশনের মাধ্যমে অস্বাভাবিক সংযোগটি সম্পর্ণভাবে তুলে আনতে হয়। যদি কোনো অংশ থেকে যায় তবে আবার রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। এমনকি জটিল

আকারও ধারণ করতে পারে। যেহেতু ওপর/হাই প্রকার ফিস্টুলার চিকিৎসা একটু জটিল। তাই এক্ষেত্রে ফিস্টুলেকটমি ও সেটন ব্যবহার করা হয়। হাই ফিস্টুলার ক্ষেত্রে সম্পর্ণ ফিস্টুলার সংযোগ কেটে আনতে গেলে রোগীর এনাল স্ফিংটার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মল ঝরবে। তাই এক্ষেত্রে সেটন ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতির ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। যেসব ক্ষেত্রে ফিস্টুলেকটমি ও সেটন ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেসব ক্ষেত্রে এন্ডোরেকটাল এডভান্সমেন্ট ফ্লাপ ব্যবহার করা হয়। উন্নত বিশ্বে এ পদ্ধতি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয়। বাংলাদেশেও আমরা এখন এ পদ্ধতির চিকিৎসা সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

অপারেশন-পরবর্তী পরিচর্যা ঃ

অপারেশনের পর মলদ্বারের ভেতর কোনো পাইপ দেয়ার প্রয়োজন নেই। ছয় ঘণ্টা পর স্বাভাবিক খাবার দেয়া যায়। ক্ষতস্থানটি ড্রেসিং করে সবসময় পরিষ্কার করে রাখিতে হবে। সাত দিন পরপর ডাক্তারের চেম্বারে আসা উচিত। যতদিন পর্যন্ত ঘা না শুকায় ততদিন চিকিৎসা নেয়া উচিত। গরম পানিতে লবণ দিয়ে কোমর ডুবিয়ে মলদ্বারে ছেঁকা দিতে হয়।

সাধারণ ফিস্টুলার ক্ষেত্রে দু-এক দিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি নেয়া যায়। জটিল ফিস্টুলার ক্ষেত্রে বেশি সময় হাসপাতালে থাকতে হয়। ক্ষত শুকাতে সাধারণত ৪ থেকে ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত লাগে। জটিল ফিস্টুলার আবার শ্রেণিভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন জটিল ফিস্টুলা আবার বিশেষ পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রয়োগে অপারেশন করতে হয়।

সার্জারিই ফিস্টুলার একমাত্র চিকিৎসা। অপারেশনের মাধ্যমে অস্বাভাবিক সংযোগটি সম্পুর্ণভাবে তুলে আনতে হয়। যদি কোনো অংশ থেকে যায় তবে আবার রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। এমনকি জটিল আকারও ধারণ করতে পারে। তাই ফিস্টুলা নিয়ে কোনো অবহেলা নয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসকের

শরণাপন্ন হয়ে যথাযথ চিকিৎসা নিলে এই রোগটি ভালো হয়ে যায়। তাই নিজের বা পরিবারের বা আত্মীয়স্বজন যাদের ফিস্টুলা হোক না কেন, লজ্জা না পেয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা উচিত যত দ্রুত রোগের চিকিৎসা গ্রহণ, করা যায় ততই মঙ্গল।

এনেমিয়া বা রক্তশূন্যতা

মানুষের রক্তে যখন লোহিত রক্তকণিকা (রক্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা আমাদের দেহে অক্সিজেন বহন করে)-এর পরিমাণ কমে যায় তখন তাকে আমরা এনেমিয়া বা রক্তশূন্যতা বলি। প্রতি দশজন মহিলার একজন এই রোগে ভোগেন এর পাশাপাশি শিশু, পুরুষ এবং রোগাক্রান্ত মানুষও এ রোগে ভুগতে পারেন।

রক্তশূন্যতার লক্ষণসমূহ

- এ রোগে আক্রান্ত হলে তোমরা মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্তি অনুভব করতে পারো অথবা দুর্বল বোধ করতে পারো, এমনকি পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং ঘুমও ক্লান্তি দূর করতে পারবে না। এর ফলে মেজাজ খিটমিটে হয়ে যেতে পারে এবং স্মরণশক্তি কমে যেতে পারে। সেই সাথে মাথা ঘোরা এবং চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়াও এ রোগের লক্ষণ।
- এ রোগে আক্রান্ত হলে হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে (যেমন- হৃদস্পন্দন কখনো বেড়ে যেতে পারে, কখনো কমে যেতে পারে), ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলা বা বুকে চাপ অনুভব করা এবং বুকে ব্যথা অনুভব করাও এ রোগের লক্ষণ।
- অবসাদ, দুর্বলতা, ক্লান্তি, বুক ধড়ফড় করা, স্বল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, মাথা ঝিমঝিম করা, হাতে-পায়ে ঝিনঝিন করা, অবশভাব হওয়া, মাথা ব্যথা করা, হাত, পা, সমস্ত শরীর ফ্যাকাশে হয়ে আসা
- এছাড়া লৌহের অভাবজনিত কারণে যেটা আমাদের দেশে বেশি দেখা যায় রক্তশূন্যতা হলে-
- অস্বাভাবিক খাদ্যের প্রতি আসক্তি
- মুখের কোণায় ঘা হয়
- জিহ্বায় ঘা বা প্রদাহ
- খাদ্য গিলতে অসুবিধা
- নখের ভঙ্গুরতা ও চামচের মতো আকৃতির নখ হয়ে যাওয়া
- খাবারে আয়রন বা লৌহের অভাবে ২ বৎসর বয়সী প্রতি ৭টি শিশুর ১টি রক্তশূন্যতায় ভোগে। এসব ক্ষেত্রে শিশুরা নানাবিধ অস্বাভাবিক জিনিস খাবার ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করে, যেমন- কাঁদা, বালি, বরফ, আঁটা বা ময়দার গুড়া ইত্যাদি। সুষ্ঠু চিকিৎসা না হলে এসব ক্ষেত্রে শিশুদের মেধা বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে পারে।
- কিশোরী বয়সের ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে অবসাদগ্রস্থতাও রক্তশূন্যতার লক্ষণ।

কারা এ রোগের ঝুঁকিতে আছেন?

- যেসব মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একই রোগে ভুগছেন।
- যেসব গর্ভধারণক্ষম মহিলার ঋতুস্রাবকালীন সময়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়।
- গর্ভবতী মহিলা।
- যারা কিডনির রোগে ভুগছেন।

- যারা লৌহ, ফলেট ও ভিটামিন বি-১২ সমৃদ্ধ খাবার কম খান।
- কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়ে।

রক্তশূন্যতার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো

- দেহে আয়রণের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা,
- থ্যালাসেমিয়া,
- এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া,
- অন্যান্য হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া,
- ব্লাডক্যান্সার বা লিউকোমিয়া
- কোন কারণে শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। যেমন-সড়ক দুর্ঘটনা বা কোনো আঘাতে রক্ত ঝরলে,
- পেপটিক আলসারের জন্য অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে বৃহদান্ত্রের কোনো রোগে
- পিরিয়ডের সময় অতিরক্ত রক্তক্ষরণ হলে
- লোহিত কণিকা তৈরি না হলে
- লোহিত কণিকা তৈরির স্থান বা অস্থিমজ্জায় কোনো সমস্যা থাকলে
- কোনো ওষুধ বা কেমোথেরাপির কারণে অস্থিমজ্জার লোহিত কণিকা তৈরির ক্ষমতা নষ্ট হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে।
- বাংলাদেশে এনিমিয়ার প্রধান কারণ খাদ্যে আয়রনের ঘাটতি, থ্যালাসেমিয়া, কৃমি ও কিডনি বিকলতা।

এনিমিয়ার কারণে যা ঘটতে পারেঃ

- গর্ভবতী মহিলাদের সদ্যজাত শিশুর ওজন কম হয়, বৃদ্ধিও কম হয়
- ডেলিভারির পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয় এবং ইনফেকশনের আশংকা থাকে
- শিশুরা এনিমিয়ায় আক্রান্ত হলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কম হয়। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কম হয়। কর্মক্ষমতা কমে যায়।

যাদের রক্তশূন্যতা মারাত্মক হতে পারে-

- গর্ভবতী মা (এক্ষেত্রে রক্তশূন্যতা শুধু মা নয়, শিশুর জন্যও হুমকিস্বরূপ)
- যেসব মা বুকের দুধ খাওয়ান
- বর্ধনশীল শিশুর রক্তশূন্যতার কারণে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। তাই শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা হয়, বৃদ্ধি ও বিকাশ কমে যায়

রক্তশূন্যতার কারণ ও করণীয়ঃ

- খাবারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহের যোগান না পেলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। প্রাণিজ খাবারের তুলনায় উদ্ভিজ খাবার থেকে মানবদেহ লৌহের যোগান কম পায় তাই, কলিজা এবং লাল মাংস বা এ ধরনের লৌহ সমৃদ্ধ প্রাণিজ খাবার না খেলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। তাই সঠিক মাত্রায় এসব খাবার গ্রহণ করা উচিত।
- দীর্ঘমেয়াদি রোগ, প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণে অনীহা কিংবা হজমে গণ্ডগোল এবং পাকস্থলির বাইপাস অপারেশনের ফলে পাকস্থলির খাবার থেকে লৌহ শোষণের ক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।
- কিছু কিছু ওষুধ এবং খাবার মানুষের পাকস্থলিতে অন্যান্য খাবার হতে লৌহ শোষণের মাত্রা কমিয়ে দেয়, এসব খাবার ও ওষুধের মধ্যে আছে- দুগ্ধজাতীয় খাবার, এন্টাসিড ওষুধ, চা ও কফি। সুতরাং লৌহ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের পূর্বে ও পরে এগুলো গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- খাবারে ফলেট ও ভিটামিন বি-১২ এর পরিমাণ কম থাকলে এসবের অভাবে আপনার শারীরে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন কমে যেতে পারে যা হতে পারে আপনার রক্তশূন্যতার কারণ। প্রাণিজ আমিষ যেমন, কলিজা, মাংস ইত্যাদিতে প্রচুর ভিটামিন বি-১২ আছে এবং যা মানবদেহ সহজে গ্রহণ করে। এছাড়া সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, শিমের বিচি, ছোলা, ডাল ইত্যাদিতে প্রচুর ফলেট রয়েছে। সুতরাং এসব খাবার সঠিক মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে।
- ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগলে শারীরে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন কমে যেতে পারে, তাই এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ সেবন করতে হবে।
- মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে এনেমিয়া হতে পারে। যেসব কারণে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে সেগুলো হল- অপারেশন, দুর্ঘটনাজনিত জখম, ঋতুস্রাব কালীন অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক রক্ত ও ওষুধ গ্রহণ করতে হয়।
- থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর দেহে রক্তকণিকার উৎপাদন কম হয়। তাই এ রোগে আক্রান্তদের নিয়মিত রক্ত গ্রহণ করতে হয়।
- অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা কম তৈরি হওয়া। এর কারণগুলো হলো-অস্থিমজ্জার স্বল্পতা লৌহ, ভিটামিন বি১২ অথবা ফলিক এসিডের অভাব (মাসিক, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দীর্ঘদিন রক্তক্ষরণ);দীর্ঘস্থায়ী জীবাণু সংক্রমণ, থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ বা লিভারের অসুখ, বিভিন্ন প্রকার ওষুধ সেবন, কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার, রঞ্জনরশ্মি বা তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব ইত্যাদি।

এছাড়া রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে করণীয়

- ছয় মাসের কম বয়সী শিশুকে অবশ্যই মায়ের দুধ পান করাতে হবে
- ছয় মাসের পর থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি খিচুড়ি, শাবসবজি, মাছ, কলা ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে
- দুই বছরের অধিক বয়সী পরিবারের সবাইকে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে
- ঘনিষ্ঠ বা নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ না করার জন্য উৎসাহী করতে হবে। নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে না হলে লোহিত রক্তকণিকার সমস্যাজনিত রক্তশূন্যতা অনেক ক্ষেত্রেই এড়া নো সম্ভব।
- যেসব অসুখে ক্রনিক রক্তক্ষরণ হয়, যেমন-থপেপটিক আলসার, হেমোরয়েড বা পাইলসের চিকিৎসা নেওয়া
- ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মহিলা, বিশেষজ্ঞ গর্ভবতী মহিলাদের প্রত্যেককে নিয়মিত আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সেবন করতে হবে
- আয়রনযুক্ত ফল ও খাবার খেতে হবে। যেমন পেয়ারা, জাম, আপেল, কাঁচা কলা, ডিম, মাংস, কলিজা, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি।

রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া কোনো অসুখ নয়। এটি অসুখের পূর্ব লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। রক্তশূন্যতা মানে রক্ত কমে যাওয়া নয় বরং রক্তের উপাদান লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলেই রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুর হার অধিক পরিমাণ বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে রক্তশূনত্যা।

থ্যালাসেমিয়াঃ উপসর্গ, কারণ ও প্রতিকার

প্রত্যেক বাবা মা-ই চায় তাদের সন্তান সুস্থ সুন্দরভাবে জন্ম লাভ করুক। কিন্ত কারো কারো এ স্বপ্ন ভেঙে যায় জানা অজানা নানা কারণে। পরিসংখ্যান মতে প্রতি, ৩০টি বাচ্চার মধ্যে একটি বাচ্চা কোনো না কোনো জন্মগত ত্রুটি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কোনো বাচ্চা শারীরিক বা গঠনগত ত্রুটি নিয়ে জন্মায় আবার কোনো বাচ্চা জেনেটিক বা ডিএনএজনিত ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। শারীরিক বা গঠনগত ত্রুটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসা থাকলেও বেশির ভাগ জেনেটিক ত্রুটির চিকিৎসা নেই বা থাকলেও অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অসম্পূর্ণ। দেশ ও জাতিভেদে জন্মগত ত্রুটির ধরন ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অনেক সময় বাবা-মা জেনেটিক রোগের বাহক হলে তাদের সন্তান উক্ত জেনেটিক রোগ নিয়ে জন্মায়। আমাদের দেশে থ্যালাসেমিয়া একটি মারাত্মক জেনেটিক/জন্মগত রক্তরোগ। যেসব সমাজে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ে-শাদি বেশি প্রচলিত সে সব সমাজে থ্যালাসেমিয়ার মতো বংশগত রোগ বালাই বেশি। বাবা-মা এ রোগের বাহক হলে তাদের সন্তান থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মাতে পারে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দশভাগ অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি পুরুষ-মহিলা নিজের অজান্তে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। আমাদের দেশে প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মায়। কিন্ত জন্মের পরপরই এ রোগটি ধরা পড়ে না। শিশুর বয়স এক বছরের বেশি হলে বাবা-মা লক্ষ্য করেন শিশুটি ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে শিশুর দুর্বলতা। আর তখনই শিশু বিশেষজ্ঞ রক্ত পরীক্ষা করে শিশুটিকে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশু হিসেবে চিহ্নিত করেন, বাবা-মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বাবা-মা জানতে পারেন যে তারা দুজনেই থ্যালসেমিয়া রোগের বাহক।

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের শারীরে রক্তের মূল্যবান উপাদান হিমোগ্লোবিন ঠিকমতো তৈরি হয় না। শিশুর বয়স এক বা দুই বছর হলে শিশুর রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে। শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে শারীরের দরকারি অঙ্গ, যেমনঃ প্লীহা, যকৃৎ বড় হয়ে যায় এবং কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে। মুখমণ্ডলের হাড়ের অস্থিমজ্জা বিকৃত হওয়ার কারণে শিশুর চেহারা বিশেষ রূপ ধারণ করে যা দেখে চিকিৎসক সহজেই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে চিহ্নিত করতে পারেন। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদেরকে অন্যের রক্ত নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন থ্যালাসেমিয়া রোগের একমাত্র চিকিৎসা যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সবসময় সফল নয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহকদের কোনো লক্ষণ থাকে না। তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। তাদের শারীরে রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সামান্য কম থাকে। তাদেরকে সাধারণত রক্ত গ্রহণ করতে হয় না। তবে একজন থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক নারী গর্ভবতী হলে রক্তের হিমোগ্লোবিন বেশি কমে যেতে পারে যে, কারণে কারো কারো গর্ভাবস্থায় দুই/এক ব্যাগ রক্ত গ্রহনের প্রয়োজন হতে পারে। যে কোনো মানুষের রক্তের সিবিসি (CBC) পরীক্ষা করে সন্দেহ করা যায় যে সে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক কিনা। এই পরীক্ষায় সন্দেহ হলে তখন হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস (Hb Electrophoresis) নামের আর একটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় সেই ব্যক্তি থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক কিনা।

এখন হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনেই থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক হয় তাহলে সুস্থ বাচ্চা পাওয়ার উপায় কী?

স্বামী এবং স্ত্রী দুজনই যদি থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক হন তবে সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃজঠরে বাচ্চার ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ণয় তাদের একমাত্র ভরসা। মায়ের গর্ভে বাচ্চার বয়স যখন ১২ হতে ১৫ সপ্তাহ তখন প্রাথমিক গর্ভফুল হতে কোষকলা সংগ্রহ (Chorionic Villus

Sampling) বা গর্ভের বাচ্চার চারপাশের পানি সংগ্রহের (Amniocentesis) মাধ্যমে বাচ্চার ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়। আর এই ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা করে গর্ভের বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া রোগ আছে কিনা তা শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়। এসময় বাচ্চার আকার থাকে দেড় হতে দুই ইঞ্চির মতো। কাজেই সুস্থ বাচ্চা পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাবা-মা গর্ভাবস্থা চালিয়ে যাওয়ার ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এ রোগ নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির তেমন উদ্যোগ নেই। একটু সচেতন হলেই আমরা এ রোগ প্রতিরোধ করতে পারি। সাইপ্রাস, বাহরাইন, ইরান, সৌদি আরব, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের মতো পৃথিবীর অনেক দেশে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর বা বাচ্চা নেয়ার আগে স্বামী-স্ত্রীর থ্যালাসেমিয়া আছে কি না তা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে থ্যালাসেমিয়া রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। যে কেউ থ্যালাসিমিয়া রোগের বাহক হতে পারে। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই জানা যায় কেউ থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা। বাবা এবং মা দুজনেই থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক হলেই কেবল সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একজন বাহক এবং অপরজন সুস্থ এমন দুজনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হলে সন্তানদের কোনো সমস্যা হবে না।

রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশাল রক্তের ভাণ্ডার প্রয়োজন হচ্ছে। আনুষাঙ্গিক খরচ বহন করতে গিয়ে আর্থিক দৈন্যতা ও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে লাখো বাবা-মা। শুধু তাই নয়, বাবা মায়ের সামনেই ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বেশির ভাগ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর জীবন প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। আমাদের দেশে থ্যালাসেমিয়া এখন এক নীরব মহামারী, যাতে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশুর মৃত্য হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে বাবা-মায়ের স্বপ্ন। সধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির করার জন্য ৮ মে সারা পৃথিবীব্যাপী বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস পালন করা হয়।

শিশু মৃত্যুর হার কমানো আমাদের এসডিসি-এর অন্যতম লক্ষ্য। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ভালো থাকার জন্য কত না পরিকল্পনা করি। সুস্থ সন্তানের বাবা-মা হওয়ার জন্য, মেধাদীপ্ত দেশ গড়ার জন্য, থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতন হই। মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করি।

বয়ঃসন্ধি ও সাদা স্রাব

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোর-কিশোরী। আর কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা, জীবন-দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের সচেতনতার ওপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

বয়ঃসন্ধিকাল কী?

একটি শিশু জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। একটা বয়সে (সাধারণত ১০ - ১৯ বছরের মধ্যে) তার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। এসময় তাকে না ফেলা যায় ছোটদের দলে না ফেলা যায় বড়দের দলে। এ সময়টাতে উল্লেখযোগ্যভাবে শারীরিক কিছু পরিবর্তনের পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কিছু মানসিক পরিবর্তনও আসে। শারীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে যৌবনের লক্ষণসমূহ (কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, মেয়েদের স্তন বৃদ্ধি ও ঋতুস্রাব, ছেলেদের দাঁড়ি-গোঁফের রেখা দেখা দেয়া, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি)। মানবজীবনের এই কালকেই বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল।

মানবজীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের কাল এই বয়ঃসন্ধিকাল। তাই এই সময়টি মানবজীবনের অন্যান্য সময়ের গুরুত্ব থেকে একটু বেশি গুরুত্ব বহন করে। এসময় বেশ কিছু করণীয় আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয়। তাহলে পুরোটা জীবন এর সুফল ভোগ করা যায়।

বয়ঃসন্ধি বয়সের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমনঃ এ সময়টাতে বুদ্ধির চেয়ে আবেগ বেশি কাজ করে। বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম থাকায় অন্যের প্ররোচনায় বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া, নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। চিন্তা ও কর্মে দুঃসাহসিক কিছু করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।অধিক লজ্জার কারণে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কে ধারণা কম থাকে। এবং যৌন আচরণের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা কম থাকে।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে বয়ঃসন্ধিকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ। আর এ সকল ঝুঁকি হ্রাসের একমাত্র উপায় হচ্ছে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে অভিভাবক ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা। কিন্তু সেই খোলামেলা আলোচনা কখনো একতরফাভাবে হবে না। এক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরীদের চেয়ে অভিভাবকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। অভিভাবকদের এই সময়টাতে সন্তানদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে।

এবার জানবে সাদা স্রাব বিষয়ে যেটি মেয়েদের অনেকগুলো শারীরিক সমস্যার একটি ঃ

স্বাভাবিক নিয়মেই মাসিকের রাস্তায় এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে, যা মাসিকের রাস্তাকে আর্দ্র রাখে। জরায়ু মুখের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হতে এই তরল পদার্থ তৈরি হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই স্রাব স্বাভাবিক। মাসিক শুরুর আগে বা মাসিক শেষ হওয়ার পর এই স্রাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত এই স্রাবকে সাদা স্রাব বলে থাকে।

কখন সাদা স্রাবকে অস্বাভাবিক বলে ধরতে হবে?

- যদি সাদা স্রাব ঘন, সাদা ক্রিমের মতো, হলুদ ইত্যাদি রং ধারণ করে;

- দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব;
- মাসিকের রাস্তায় চুলকানি বা জ্বালাপোড়া হয়।

জানবে অস্বাভাবিক সাদা স্রাব কেন হয়?

- মাসিকের রাস্তায় বা যোনিপথে ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হলে;
- জরায়ুমুখে প্রদাহ হলে;
- দীর্ঘদিন অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেলে;

সমস্যা থাকলে তার সমাধানও আছে। রোগ যেমন আছে তেমনি তার চিকিৎসাও আছে। এবার জেনে নিই কীভাবে অস্বাভাবিক সাদা স্রাবের চিকিৎসা করা হয়।

- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- মাসিকের সময় সঠিক নিয়মে জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার।
- গোসলের সময় কোমল সাবান বা গরম পানি ব্যবহার করে মাসিকের রাস্তার আশেপাশে পরিষ্কার করা।
- প্রত্যেকবার পায়খান বা প্রস্রাবের পর সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা।
- একশত ভাগ সুতি পোশাক পরা। আঁটসাট পোশাক পরিহার করা।

সাদা স্রাবের কারণ চিহ্নিত করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক অথবা এন্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করতে বলা হয়। অনেক সময় ছত্রাকনাশক ক্রিম ব্যবহার করতে বলা হয়। তবে মনে রাখতে হবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাদা স্রাব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই শারীরে এর কোনো ক্ষতিকর প্রভাবও নেই।

অটিজম ঃ কারণ শনাক্তকরণ ও করণীয়

অটিজম এমন একটি রোগ যা আমাদের আশেপাশে, পরিবার, আত্মীয়সজন ও সমাজের অনেক শিশু, কিশোর-কিশোরীদের আক্রান্ত হতে দেখি। অবহেলা ও অবজ্ঞার সাথে তাদের জীবনযাপন করতে দেখি। যা আসলেই দুঃখজনক ব্যাপার। অটিজম আসলে কী এবং কেন হয়? অটিজম হচ্ছে মস্তিষ্কের বিন্যাসগত সমস্যা। অটিজম শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে, যার ফলে শিশু শুধুমাত্র নিজের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শিশু যখন শুধু নিজের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে তখন তার অন্যদের সাথে যোগাযোগ, সামাজিকতা, কথা বলা, আচরণ ও শেখা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইদানিং অটিজম নিয়ে মানুষ কিছুটা জানলেও এ রোগটি আগে থেকেই ছিল। শনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি বলেই রোগটিকে নতুন মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রথম ধারণা দেন হেনরি মোসলে নামে একজন ব্রিটিশ সাইকিয়াট্রিস্ট ১৮৬৭ সালে।

"অটিজম" কী?

বুদ্ধিবৃত্তিক ও আচরণগত সীমাবদ্ধতার বিশেষ কিছু লক্ষণের সামষ্টিক নাম অটিজম। কথাবার্তায় পিছিয়ে থাকা, আত্মমগ্ন থাকা, অসংলগ্ন আচরণ করা -অটিজমের কিছু সাধারণ লক্ষণ। শিশুর বয়স ২/৩ বছর থেকে শুরু করে এসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অটিজম কোনো সাধারণ রোগ নয়। এটি শিশুদের একটি মনোবিকাশগত জটিলতা যার ফলে সাধারণত ৩টি সমস্যা দেখা দেয়া।

যেগুলো হচ্ছে -

প্রথমতঃ মৌখিক কিংবা অন্য কোনোপ্রকার যোগাযোগ সমস্যা,

দ্বিতীয়তঃসমাজিক বিকাশগত সমস্যা,

তৃতীয়তঃ খুব সীমাবদ্ধ ও গণ্ডিবদ্ধ জীবন-যাপন ও চিন্তা-ভাবনা এবং পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে এছাড়া অতি চাঞ্চল্য, জেদি ও আক্রমণাত্মক আচরণ আচরণকরে।

তোমাদের জানা দরকার যে, রোগটি কোন্ বয়সে এবং কীভাবে সনাক্ত করা যায়

সাধারণত শিশুর বয়স ১৮ মাস থেকে ৩ বছর এবং মধ্যে এই রোগ দ্ব্যর্থহীনভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। এখানে উল্লেখ্য যে যত দ্রুত রোগটি সনাক্ত করা যায়, শিশুর জন্য ততই মঙ্গল।

সাধারণত কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে অটিষ্টিক রোগটি শনাক্তকরণ সম্ভব ঃ

সাধারণত এদের ভাষার বিকাশ হতে বিলম্ব হয়। এক বছর বয়সে অর্থবহ অঙ্গভঙ্গি, ১৬ মাস বয়সে একটি শব্দ এবং ২ বছর বয়সে ২ শব্দের বাক্য বলতে পারে না। এই রোগে আক্রান্ত শিশুসমবয়সী কিংবা অন্যান্যদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। এরা নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেয় না এবং আপন মনে থাকতে পছন্দ করে। এরা অন্যদের চোখের দিকে তাকায় না। অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসে না কিংবা আদর করলেও ততটা সাড়া দেয় না। একই কথা পুনরাবৃত্তি করে এবং একই কাজ বারবার করতে পছন্দ করে। এদের কাজকর্ম এবং সক্রিয়তা সীমিত ও গণ্ডিবদ্ধ। পরিবেশ এবং আশেপাশের কোনো পরিবর্তন খুব অপছন্দ করে। এরা কখনো কখনো অতি সক্রিয়, আবার কখনো কখনো খুব কম সক্রিয়

হয়। সাধারণত খেলনা দিয়ে কোনো গঠনমূলক খেলা খেলতে পারে না অথবা কোনো বিশেষ খেলনার প্রতি অত্যধিক মোহ দেখা যায়। কখনো মনে হতে পারে যে এরা কানে কম শুনে। এরা মাকে বা অন্য কোনো প্রিয়জনকে জড়িয়ে ধরে না এবং তাদে কেউ ধরলেও তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় না অথবা অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এরা কখনো আত্মপীড়ন করে এবং মনে হয় তাতে সে তেমন কষ্ট পায় না। কোনো বিশেষ কিছুর প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ থাকে যেমন- কাগজ ছেঁড়া, পানি, তরল পদার্থ দিয়ে খেলা, চাল, ডাল দানাদার কিছু দিয়ে খেলা ইত্যাদি।

কী কারণে অটিজম রোগটি হতে পারেঃ

এখনো পর্যন্ত অটিজম কেন হয় তার সঠিক কারণ উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। মনেবিকাশের প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে মস্তিস্কের অস্বাভাবিক জৈব রাসায়নিক কার্যকলাপ, মস্তিস্কের অস্বাভাবিক গঠন, বংশগতির অস্বাভাবিকতা, এমনকি বিভিন্ন টিকা প্রয়োগ থেকে এই রোগ হতে পারে বলা হলেও নির্দিষ্ট করে কিছু এখনো জানা সম্ভব হয়নি। কাজেই কোনো বাবা মা ও আত্মীয়-স্বজন নিজেদের দোষী ভাবা অথবা বাবা-মাকে দায়ী করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অটিজমের জন্য দায়ী সঠিক কোনো কারণকে এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়নি। তবে কিছু কিছু গবেষণা থেকে অটিজমের কারণ হিসেবে মনে করা হয়। তা তোমরা এখন জানবে, তাহলে শোনোঃ

- মস্তিষ্কের গঠনগত ত্রুটি
- মস্তিষ্কের বিকাশগত প্রতিবন্ধীকতা সাম্প্রতিককালে বিশেষজ্ঞরা মস্তিষ্কের বিকাশের প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে ব্রেনের কিছু অস্বাভাবিক রাসায়নিক কার্যকলাপ কিংবা ব্রেনের কিছু অস্বাভাবিক গঠনকে দায়ী করেছেন।
- শরীরের নিউরো কেমিক্যাল এর অসাম্যতা
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেনেটিক্যাল কারণকে দায়ী করা হয়।

এবার রোগটির সম্ভাব্য কারণসমূহ জানা দরকার ঃ

- গর্ভকালীন সময়ে মার ভাইরাস জ্বর বিশেষ করে রুবেলা ভাইরাস, Cytomegalovirus ইত্যাদি।
- শিশুকালীন টিকা বিশেষ করে গগজ টিকা।
- জন্মের সময় শিশুর অক্সিজেনের অভাব।
- শিশুর কোনো কারণে খিচুনি রোগ।
- প্রসবকালীন সময়ে Syntocinon drip ব্যবহার।
- খাদ্যনালিতে ছত্রাকের আধিক্য।
- খাদ্যে এলার্জি।
- পরিবেশ দূষণ।
- অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক গ্রহণ।
- বংশগত কারণ।

অটিস্টিক শিশুদের বিভিন্ন পর্যায় কোন্ ধরনের ঃ

সাধারণত অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। বয়সের সাথে নয় বরং প্রতিটি শিশুর সামর্থের ওপর তার পর্যায় নির্ভর করে। পর্যায়গুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

প্রথম পর্যায়, আত্মকেন্দ্রিক স্তরঃ এই পর্যায়ে শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক থেকে এবং আপন মনে একাকি খেলতে পছন্দ করে। এরা সাধারণত কোনো আদেশ-নিষেধ অথবা নির্দেশ বুঝতে পারে না ও পালন করে না।

দ্বিতীয় পর্যায়, অনুরোধকারী স্তরঃ এই পর্যায়ের শিশুরা শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে খুব কাছের লোকদের সাথে অল্প সময়ের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য অনুরোধ করে।

তৃতীয় পর্যায়, যোগাযোগ স্থাপনকারী স্তরঃ এই পর্যায়ের শিশুরা কিছু প্রচলিত শব্দ বুঝতে পারে এবং অতি পরিচিত মানুষের সাথে অল্প সময়ের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তারা ছোটখাটো আদেশ-নির্দেশ পালন করতে পারে।

চতুর্থ পর্যায়, সহযোগী স্তরঃ এই পর্যায়ের শিশুরা পরিচিত সমবয়সী শিশুদের সাথে অল্প সময়ের জন্য খেলা করে। ভাষায় দক্ষতা একটু ভালো এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে পৃথিবীতে অটিজম রোগটি প্রায় মহামারীর পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এমনকি কেউ কেউ একে এইচআইভি এইডস এর সাথে তুলনা করেছেন। আমাদের দেশে সঠিক তথ্য না থাকলেও গড়ে প্রতি হাজারে ১০ থেকে ২০টি শিশু এই রোগে আক্রান্ত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। উন্নত দেশগুলোতে এই সংখ্যা আরও বেশি বলে জানা গেছে।

অটিজম রোগটির কি কোনো চিকিৎসা আছে?

সত্যিকার অর্থে অটিজম সারিয়ে তোলার জন্য কোনোপ্রকার জাদুকরি চিকিৎসা এখনও পর্যন্ত অবিষ্কৃত হয়নি। এরূপ পরামর্শে বিভ্রান্ত হওয়া বোকামী। তবে নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায় মনে করাও সঠিক নয়। কেননা বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, পিতা-মাতা ও আপনজনদের শ্রম ও যত্ন এবং এই রোগের সাথে সংশিস্নষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহায়ক দলের একত্রে কার্যক্রমে শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলেও একটি শিশুকে স্বাধীন জীবনযাপন করার মতো পর্যায় আনা সম্ভব হয়। অটিজমের কোনো জাদুকরি চিকিৎসা নেই। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে অটিজমের নানা ধরনের চিকিৎসা বের হয়েছে। তার ভিতর সবচেয়ে প্রচলিত ও কার্যকরিচিকিৎসা হচ্ছে অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতিসমূহ। যত দ্রুত এই রোগটি সনাক্ত করা যায় এবং যত দ্রুত একটি অটিস্টিক শিশুকে সঠিকভাবে যথোপযোগী একটা

শিক্ষা কার্যক্রমে সমপৃক্ত করা যায় তত তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করা সম্ভব। অটিজমের কারণসমূহ চিহ্নিত না করতে পারলেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে গত ২০ বছরে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রতিটি অটিস্টিক শিশু কিশোরকে তাদের প্রতিভা ও সীমাবদ্ধতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে একটা যথোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে পারলে এই শিশুরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। একটু সহযোগিতা পেলে অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন অটিস্টিক শিশু কিশোররা সাধারণ স্কুল-কলেজেও সাফ্যলের পরিচয় রাখতে পারে। বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহ অটিস্টিক ব্যক্তিদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অনেক এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশ এখনও শিশু অবস্থায়।

এ ধরনের শিশুর বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের অটিস্টিক শিশুদের জন্য যা করণীয় তা হচ্ছেঃ

এ ধরনের শিশুর বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুটিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান। কিছু ঔষধপত্র প্রয়োগ যা তার অন্যান্য শারীরিক অসুবিধা দূরীকরণে সহায়তা করে। দ্রচততার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যা শিশুটির ভাষা বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, স্বাবলম্বিতার বিকাশ, বিশেষ দক্ষতার বিকাশ এবং অন্যান্যস্বকীয়তা অর্জনে সহায়তা করবে। সামাজিক স্বীকৃতি এবং সকলের সহযোগিতা এই ধরনের শিশুর বিকাশের জন্য খুবই জরুরি। সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে বেশির ভাগ মানুষ এখনো এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানে না। তাই অটিস্টিক শিশুর জন্য যা প্রয়োজনঃ

- শিশুটি অটিস্টিক কিনা তা দ্রত শনাক্তকরণ।
- দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষ করে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হয় এমন বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।
- অকুপেশনাল এবং স্পীচ থেরাপস্টের পরমর্শ গ্রহণ।
- বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণ।
- অন্য শিশুদের বিশেষ করে অপ্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে বেশি মেশার সুযাগ তৈরী করা।
- মনে রাখবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী এবং অপ্রতিবন্ধী শিশুদের তুলনায় অটিস্টিক শিশুর যারা দেখাশুনা করছেন অর্থাৎ বাবা-মা এবং সেই পরিবারের সহযোগিতা বেশি প্রয়োজন হয়। তাই অবহেলা নয় শুধু দরকার সহযোগিতা ও ভালোবাসা।

অটিস্টিক শিশুর জন্য আমাদের যা যা করা জরুরি তা জেনে নিই তাহলে তাদেরকে বুঝতে সহজ হবে ঃ

- শিশুটিকে সহজভাবে গ্রহণ করা ও শিশুর বর্তমান অবস্থা মেনে নিয়ে ধৈর্য্যশীল, সহমর্মী ও আন্তরিক হতে হবে।
- শিশুর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করো।
- শিশুর শেখার উপযোগী পরিবেশ তৈরীসহ সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করো।
- শিশুকে সহজ ভাষায় নির্দেশনা এবং তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করো।
- শিশুকে তার দৈনন্দিন কাজ করতে সাহায্য করো।

- কোনো কাজ সে সঠিকভাবে করতে পারলে তাকে উৎসাহ দিতে হবে (আদর, চুমু, পিঠ চাপড়ে দেয়া প্রভৃতি)।

কোন্ কোন্ আচরণ করা যাবে নাঃ

- শিশুকে ভয় না।
- শারীরিক আঘাত করা যাবে না। (অনেক বিরক্তিতেও না)
- কোনো কাজ করানোর জন্য জোর করা যাবে না।
- শিশুকে ঘরে বন্দি করে রাখা যাবে না।
- বিপদজনক জিনিস শিশুর হাতের কাছে রাখা যাবে না।

আলোচনা থেকে যা জানলে তা শুধু নিজের মধ্যে রাখলে হবে না বরং অটিস্টিক শিশুর অভিভাবকদের জন্য কিছু করণীয় বা বক্তব্য তাদের কাছে পৌছাতে হবে যাতে তারা নিজেদেরকে কোনোভাবেই অসহায় না ভাবতে পারে। তাদের বলতে হবে-

- নিজেকে অসহায় কিংবা একা ভাববেন না।
- শিশুর প্রতিভা কিংবা ভালো দিকগুলো বিকাশে সাহায্যে করুন।
- বাড়িতে শিশুর জন্য গঠনমূলক প্রোগ্রাম তৈরি করুন।
- শিশুর যোগাযোগ ও সামাজিক বিকাশে জোর দিন।
- ধৈয্য হারাবেন না। কারণ এই শিশুদের অনেক উন্নতি সম্ভব।

সারাবিশ্বে অটিস্টিক শিশুদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেড়েই চলছে। সঠিক পরিসংখ্যন না থাকলেও অনুমান করা হচ্ছে বাংলাদেশেও অটিস্টিক শিশু কিশোরদের হার ভয়াবহ। অটিষ্টিক শিশুরা কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হয়। এই ধরনের শিশুদের তাই বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশু বা বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদাসম্পন্ন বলা হয়। যথাযথভাবেতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে বিধায় এদের প্রতিবন্ধী আখ্যায়িত করা সঠিক নয়।

নবজাতক শিশুর যত্ন

নবজাতক শিশুর যত্ন যা সমন্ধে সবার জানা খুবই দরকার এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এই বিষয়ে সচেতন করা সবার দ্বায়িত্ব।

দীর্ঘ ১০ মাস সাধনার পর একজন মা একটি শিশুর জন্ম দেন। জন্মের পর মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন পৃথিবীর নতুন এ অতিথিকে রাখতে কত কিছুই না করে থাকেন। আজকের সদ্যজাত শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। সময়ের সাথে সাথে জীবনের বিভিন্ন স্তর শৈশব, কৈশোর, যৌবন পার করার মাধ্যমে শিশুটি হয়ে উঠবে আগামীর ভবিষৎ যাদের নিপুণ সুচিন্তা ও স্বপ্নে গড়ে উঠবে সুন্দর বাংলাদেশ। তাই প্রত্যেক মা ও পরিবারের সদস্যদের যত্ন বিষয়ে সচেতন ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার।

সদ্যজাত শিশুর যত্নে যা যা করা উচিত ঃ

একটি সুস্থ্য সন্তান সবারই কাম্য। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সন্তান জন্মলাভের পর তার যত্নে সকলেই থাকেন উৎসুক। তবে সেজন্য চাই সঠিক নিয়ম। আসুন জেনে নিই সদ্যজাত শিশুর যত্নে যা করবেন।

জন্মের পরপর

- নবজাতক শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো
- নবজাতককে গরম রাখা
- নবজাতকের গোসল
- নাভির যত্ন
- চুল কাটা
- চোখের যত্ন
- ত্বকের যত্ন
- সময়মতো টিকা দেয়া
- নবজাতকের খারাপ লক্ষণ বা বিপদচিহ্ন খেয়াল করা।

নবজাতককে মুছুন/পরিষ্কার করাঃ

- পরিষ্কার এক টুকরা বড় কাপড়ের ওপর শিশুকে নিন।
- কাপড় দিয়ে নবজাতকের সারা শরীর জড়িয়ে ফেলুন।
- কাপড় দিয়ে নবজাতকের মাথা ভালোভাবে মুছুন।
- এরপর নবজাতকের গলা, ঘাড় ও কাঁধ ভালোভাবে মুছুন।
- এভাবে বুক, পেট ও হাত ভালোভাবে মুছুন।

- এরপর নবজাতকের পিঠ ভালোভাবে মুছুন।
- নবজাতকের কোমর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত ভালোভাবে মুছুন।
- মোছা শেষে কাপড়টি ফেলে দিন।

নবজাতককে মোড়ানো/গরম রাখা ঃ

- মোড়ানোর জন্য শুকনো ও পরিষ্কার এক টুকরো বড় সুতি কাপড়ের ওপর নবজাতককে নিন।
- লক্ষ রাখুন, যাতে কাপড়ের কিছু অংশ নবজাতকের মাথার ওপরের দিকে ও কিছু অংশ পায়ের নিচের দিকে বাড়তি থাকে।
- প্রথমে মাথার ওপরের দিকের কাপড়ের বাড়তি অংশ দিয়ে নবজাতকের মাথা কপাল পর্যন্ত ঢেকে নিন। কাপড়ের ওপরের দুই কোনো নবজাতকের দুই কাঁধের ওপর এসে কাঁধ ঢেকে দেবে।
- এবার পায়ের দিকের কাপড়ের বাড়তি অংশ দিয়ে নবজাতকের পা ঢেকে দিন।
- এবার নবজাতকের শারীরের দুই পাশের বাড়তি কাপড় দিয়ে বুক ও পেট ভালোভাবে ঢেকে দিন।
- পুরোপুরি মোড়ানোর পর শিশুকে গরম রাখার জন্য মায়ের বুকে দিতে হবে।
- এরপর শালদুধ খাওয়াতে সহায়তা করুন।

নবজাতকের যেসব সমস্যা হতে পারে

- জন্মের পরপর শ্বাস না নেওয়া
- জন্মের পর না কাঁদা
- খিঁচুনি হওয়া
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- শ্বাস নিতে বা ছাড়তে কষ্ট হওয়া
- শরীরের তাপ বেড়ে যাওয়া
- শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া
- শরীর হলুদ রঙের হয়ে যাওয়া
- নাভি লাল, নাভিতে দুর্গন্ধ বা পুঁজ থাকা
- চামড়ায় ঘা, ফোসকা বা পুঁজসহ বড় দানা-লাল ও ফোলা
- অনবরত বমি
- নেতিয়ে পড়লে বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম নড়াচড়া করলে
- দুর্বল, অনিয়মিত কাঁদা বা কাঁদতে না পারলে।

নবজাতকশ্বাস না নিলে যা করতে হবে ঃ

- পরিষ্কার নরম কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে শিশুর সম্পূর্ণ শরীর আরও ভালো করে মুছুন।
- নাকে ও মুখে কালচে সবুজ ময়লা লেগে থাকলে তা আঙুলে কাপড় পেঁচিয়ে পরিষ্কার করুন।
- শিশুকে কাত করে পিঠে শিরদাঁড়া বরাবর নিচ থেকে ওপর দিকে বারবার হাতের তালুর নিচের অংশ দিয়ে ঘষুন।
- শিশুর রং এবং শ্বাসের দিকে লক্ষ করুন। যদি ঠোঁট, জিহবা ও মুখের রং গোলাপী হয় এবং নিয়মিত শ্বাস নিতে থাকে, তাহলে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে।
- পা ওপরে ধরে উল্টো করে নবজাতককে ঝোলানো
- থাপড় দেয়া
- শরীরে ঠাণ্ডা পানি ছিটানো
- কানে অথবা নাকে ফুঁ বা বাতাস দেয়া
- পানিতে স্যাকা
- বুকের খাঁচায় চাপ দেয়া
- বাচ্চাকে পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা পানিতে স্যাকা
- গর্ভফুলকে গরম করা
- গর্ভফুলের অপেক্ষায় নবজাতককে রাখা
- মুখে ফুঁ দেয়া
- কানে ফুঁ দেয়া

গরমে যত্ন ঃ অনেক অভিভাবকই প্রচুর পরিমাণে পাউডার বা তেল শিশুর ত্বকে ব্যবহার করেন, যা ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত পাউডার ব্যবহারে শিশুদের ত্বকের রোমকূপগুলো বন্ধ হয়ে যায় বলে সাধারণত শারীরিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। এতে শিশুর ঘামাচি ও ন্যাপি হতে পারে। অতিরিক্ত রোদে ছোট বাচ্চা নিয়ে বের হওয়া উচিত নয়। নবজাতকের সামনে হাঁচি-কাশি দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। শিশুকে ঠাণ্ডা ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশে রাখা উচিত। ঘেমে গেলে বারবার শুকনো নরম কাপড় দিয়ে গা মুছে দিন। অবশ্যই শিশুকে সুতির নরম ও আরামদায়ক পোশাক পরানো উচিত। নবজাতকের মাকে প্রচুর পরিমাণে তরলজাতীয় খাবার ও পানি খেতে হবে। এতে মায়ের বুকের দুধ থেকে শিশু উপকৃত হবে।

শীতে যত্ন ঃ সুতি কাপড় পরিয়ে কাঁথা দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে। সোয়েটার ব্যবহার করতে হবে। শিশুর গায়ে বেবি অয়েল বা ভ্যাসলিন ব্যবহার। দিনের বেলা জানালা খুলে রোদ ও (ঠাণ্ডা বাতাস এলেও) নির্মল বাতাস ঘরে ঢুকতে দিন। ঘরের মধ্যে কাপড় না শুকিয়ে অবশ্যই রোদে শুকাতে হবে। শিশুকে রাতে ডায়াপার পরিয়ে শোয়ানো। বাচ্চাকে দোলনায় বা আলাদা মশারির নিচে না রেখে মায়ের কোলঘেঁষে শোয়ানো। এতে বাচ্চা উষ্ণ থাকবে, মায়ের সঙ্গে আন্তরিকতা বাড়বে এবং বুকের দুধ খাওয়াতে সুবিধা হবে। ঘরের বাইরে নেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। রোদে দিতে হলে জানালার পাশে বা ঘরের বারান্দা থেকে রোদ লাগানো। কাশি, শব্দ করে শ্বাস টানা, দুধ টেনে খেতে না পারা, শ্বাস নিতে কষ্ট বা পাঁজর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেঁকে যেতে থাকলে অতি দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে।

শিশুকে সুস্থ-সবল একজন মানুষরূপে পৃথিবীতে স্থান করে দেয়া বাবা-মাসহ পরিবারের দায়িত্ব। তাই এ দায়িত্ব পালনে নিজে সচেষ্ট ও অন্যকেও উৎসাহিত করতে হবে। পরিশেষে সময়মতো শিশুকে টিকা দিতে হবে।

শিশুর প্রয়োজনীয় টিকাসমূহ

দীর্ঘ ৯ মাস সাধনার পর একজন মা একটি শিশুর জন্ম দেন। জন্মের পর মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন পৃথিবীর নতুন এ অতিথিকে সুস্থ-সবল রাখতে কত কিছুই না করে থাকেন। একটা সময় আসে শিশুটিকে প্রয়োজনীয় টিকা দেয়ার। মা-বাবা ভাবতে থাকেন, আমরা আমাদের শিশুর প্রয়োজনীয় টিকাগুলো ঠিকমতো দিচ্ছি? সব ঠিকঠাক আছে তো? সাধারণত আমাদের বেশির ভাগ মানুষেরই শিশুদের প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই।

শিশুর টিকা সমূহ ঃ

শিশুকে সঠিক সময়ে সব টিকা দিতে হবে। সরকার বছরে এক দিন জাতীয় টিকাদান দিবস হিসেবে পালন করে। আরও এক দিন বাড়তি রাখা হয়। কোন্ টিকা কোন্ সময়ে দিতে হবে জেনে নেয়া যাক।

প্রতিষেধক ৫টি টিকা? তাহলে এবার জানবো সে বিষয়েঃ

পোলিও টিকা:

পোলিও মারাত্মক একটি রোগ। এ রোগ প্রতিরোধে শিশুকে অবশ্যই পোলিও টিকা দিতে হবে। এ টিকাটি চারটি ডোজে খাওয়াতে হয়। প্রথম ডোজটি শিশুর জন্মের দিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে

খাওয়াতে হয়। পরবর্তী দুটি ডোজ চার সপ্তাহ পরপর খাওয়াতে হয়। চতুর্থ ডোজটি হামের টিকার সঙ্গে খাওয়াতে হয়।

বিসিজি টিকা:

বিসিজি টিকাটি মারাত্মক রোগ যক্ষ্মা প্রতিরোধ করে। তাই এটিকে যক্ষ্মার প্রতিষেধক টিকা বলা হয়। সাধারণত জন্মের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে এ টিকা দিতে হয়। একটিই। বাঁ হাতের কাঁধের কাছের হাতের অংশের চামড়ার নিচে এটি দেয়া হয়। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। যেমন- ক্ষত হওয়া, লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

ডিপিটি টিকা:

ডি-তে ডিপথেরিয়া, পি-তে পারটোসিস বা হুপিং কাশি ও টি-তে টিটেনাস। তাই ডিপিটি টিকাটি এ তিনটি রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এ তিনটি রোগই আলাদা আলাদাভাবে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। সাধারণত শিশুর জন্মের ছয় সপ্তাহ পর থেকে শুরু করে চার সপ্তাহ পরপর তিনটি ডোজ দিতে হয়। জেনে রাখা ভালো, এ টিকাটি ছয় সপ্তাহের আগে ও পাঁচ বছরের পর দেয়া যাবে না।

এমএমআর টিকা (মাম্পস, মিজলস, রুবেলা) ঃ

হাম শিশুদের জন্য মারাত্মক কষ্টদায়ক একটি রোগ। এ রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই শিশুকে হামের টিকা দিতে হবে। সাধারণত শিশুর ৯ মাস বয়সে এ টিকা দিতে হয়। মনে রাখতে হবে, এ টিকার সঙ্গে শিশুকে পোলিওর চতুর্থ ডোজও একটি ভিটামিন ক্যাপসুলও খাওয়াতে হবে। এর খুবই বিরল কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। অ্যালার্জি, চামড়ায় র‍্যাশ হওয়া, টিকা স্থানে ব্যথা ও লাল হওয়া, এবং ফুলে যাওয়া।

হেপাটাইটিস-বিও হিব টিকা ঃ

হেপাটাইটিস-বি এর কারণে জন্ডিসসহ লিভারের নানা মারাত্মক রোগ হতে পারে। তাই শিশুকে অবশ্যই দুই বছর বয়সের পর এ টিকাটি দিতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত এ টিকাটি দুটি ডোজে দেয়া হয়। প্রথম ডোজের ছয় মাস পর দ্বিতীয় ডোজ দেয়া হয়। আর হিব টিকা নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিসকে প্রতিরোধ করে।

টাইফয়েড টিকা ঃ

টাইফয়েড এমনই মারাত্মক একটি ব্যাধি, যা আপনার শিশুর যে কোনো অঙ্গ বিকল করে দিতে পারে। এমনকি জীবন পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। তাই শিশুকে অবশ্যই টাইফয়েডের টিকা সময়মতো দিতে হবে। সাধারণত শিশুকে দুই বছর বয়সের পর এ টিকা দিতে হয়। টাইফয়েডের টিকাটি তিন বছর পরপর দিতে হয়।উল্লিখিত টিকাগুলো শিশুর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এছাড়া বর্তমানে অন্য নানা রোগের টিকা দেয়া হয়। টিকা দেয়ার পর শিশুর জ্বর আসতে পারে বা টিকার স্থান লাল হয়ে ফুলে যেতে পারে। অনেক সময় টিকা খাওয়ানোর পর পাতলা পায়খানাও হতে পারে। এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এমনটি হলে টিকা দেয়ার ২ থেকে ১০ দিনের মধ্যে এমনিতেই শিশু সুস্থ হয়ে উঠবে।

ডায়রিয়া ঃ

বাচ্চাদের ডায়রিয়ার প্রধান কারণ রোটা ভাইরাস। রোটা ভাইরাসের প্রতিষেধক দিতে হবে। প্রতিবছর অনেক শিশু এ ভাইরাসের ইনফেকশনে মারা যায়। ডায়রিয়া প্রতিষেধকের টিকা তিনটি ডোজ। প্রথম ডোজ ৬ থেকে ১২ সপ্তাহে এবং পরবর্তী ডোজগুলো ৪ থেকে ১০ সপ্তাহ পরপর ও শেষ ডোজ অবশ্যই ৩২ সপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে। এ তিনটি টিকাই মুখে খাওয়ার।

নিউমোনিয়া ঃ

শিশুদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টিকা নিউমোনিয়া। বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নিউমোনিয়া বা অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনকে শিশুমৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী ভাইরাস হলো নিউমোকক্কাস (স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি) ও হেমোফাইলাস ইনয়ুযেকি। এই দুই ভাইরাসকে ধরাশায়ী করতে টিকাদানের বিকল্প নেই। এজন্য সিজনাল অ্যান্টি ভাইরাল ভ্যাকসিন বা নিউমোকক্কাসের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন যে কোনোটি দিলেই হয়। নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের সংক্রমণ রোধে অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের টিকা দিতে হয়। নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন দেয়া থাকলে ফুসফুসের সংক্রমণের তীব্রতা কম হয় এবং ঝুঁকি কম থাকে।

হবু মায়েদের টিটি টিকা নিতে হবে যেন বাচ্চার ধনুষ্টঙ্কার না হয়। যদি আগে কোনো টিকা নেয়ানা থাকে, তবে সবগুলোই দিতে হবে। জানা না থাকলে কমপক্ষে দুটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রাইমেস্টারে দিতে হবে। ১৫ থেকে ৪৯ বছরের মহিলাদের গর্ভধারণের আগেই পাঁচটি টিটি ডোজ নেয়া জরুরি। প্রথমটির এক মাস পরে দ্বিতীয়টি, তারও এক মাস পরে তৃতীয়টি, তার ছয় মাস পরে চতুর্থ ও শেষ ডোজটি তার এক বছর পর দিতে হয়।

প্রত্যেক মা-বাবার যেসব বিষয় মনে রাখা জরুরী:

- শিশুর জন্মের এক বছরের মধ্যে আবশ্যক টিকাগুলোর সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে বিসিজি (যক্ষ্মা), ডিপিটি (ডিপথেরিয়া-হুপিংকাশি-ধনুষ্টঙ্কার), পোলিও, হেপাটাইটিস বি ও হামের টিকা। এছাড়া রয়েছে নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, বসন্ত ও অন্য কিছু টিকা, যা বাধ্যতামূলক নয়।
- একই টিকার দুটি ডোজের মধ্যে কমপক্ষে ২৮ দিনের বিরতি থাকা উচিত।
- একই দিনে একাধিক টিকা দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই
- কোনো কারণে তারিখ পার হয়ে গেলে পোলিও, ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি তারিখের অনেক পরে এমনকি এক বছর পরে দিতেও সমস্যা নেই
- পোলিও টিকা মুখে খেতে হয় বলে ডায়রিয়া থাকলে শিডিউলের ডোজ খাওয়ানোর পর ২৮ দিন বিরতিতে একটি অতিরিক্ত ডোজ খাওয়ানো হয়।
- বিসিজি টিকা দেয়ার এক মাসের মধ্যে টিকার স্থানে ঘা হওয়ার কথা।
- সাধারণত ডিপিটি বাম উরুতে ও হেপাটাইটিস ডান উরুতে দেয়া হয়।
- নয় মাস বয়সের আগে হামের মতো হতে থাকলেও যথাসময়ে মানে নয় মাস পূর্ণ হলেই হামের টিকা দেয়া।
- ছোটখাটো অসুস্থতা যেমনঃ জ্বর, বমি, ডায়রিয়া ইত্যাদি কারণে টিকাদান স্থগিত করার কারণ নেই। মারাত্মক অসুস্থ শিশু, খিঁচুনি হচ্ছে এমন শিশু এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, যেমনঃ কেমোথেরাপি গ্রহণকারী বা এইচআইভি আক্রান্ত শিশুকে টিকা না দেয়াই উচিত।
- যেসব শিশুর স্নায়ুরোগ আছে, তাদের ডিপিটি না দিয়ে ডিটি দেয়াই ভালো।

মনে রাখতে হবে, শিশুকে সুস্থ-সবল একজন মানুষরূপে পৃথিবীতে স্থান করে দেয়া বাবা-মাসহ পরিবারের দায়িত্ব। তাই এ দায়িত্ব পালনে নিজে সচেষ্ট ও অন্যকেও উৎসাহিত করতে হবে। সময়মতো শিশুকে টিকা দিই ও সুস্থ পরিবার নিয়ে ভালো থাকি।

কিশোরীদের প্রজনন-স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

বয়ঃসন্ধিকালে নিজেদের দেহ সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি হয়। নিজেদের দেহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ভালো এবং এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এ সময় থেকেই প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন-স্বাস্থ্য সেবা কী, সে বিষয়ে সঠিকভাবে জানা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এতে করে নিজেদের প্রজনন-স্বাস্থ্যের যত্নের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। অনেকেই মনে করে, প্রজনন-স্বাস্থ্য কেবল নারীদের জন্য এবং শুধু গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবপরবর্তী সময়েই এর বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। আর সেটাই হচ্ছে প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা!এছাড়া অনেকেই আবার ভাবে, পুরুষ বা নারীরা যখন কোনো যৌন রোগে আক্রান্ত হয়, তখন বা যৌন রোগ প্রতিরোধের জন্য যে সেবা প্রদান করা হয়, তাই প্রজনন সেবা! কিন্তু ধারণা দু'টি ভুল। মনে রাখবে, একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই প্রজনন-স্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত।

প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন-স্বাস্থ্য বলতে আসলে কী বোঝায় ?

গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম হওয়ার জন্য নারী ও পুরুষের শরীরের যেসব অঙ্গ জড়িত, এগুলোকে একসঙ্গে প্রজননতন্ত্র বলে। নারী ও পুরুষভেদে প্রজননতন্ত্রকে দুই ভাগ করা হয়েছে: মেয়েদের প্রজননতন্ত্র। কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য কেবল তাদের প্রজনন সম্পর্কিত শারীরিক গঠন প্রণালি, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রক্রিয়ায় কোন রোগের প্রভাব বা অক্ষমতাকে বোঝায় না। কিশোরীদের প্রজনন-স্বাস্থ্য বলতে পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণের একটি অবস্থাকে বোঝায়। এটা বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা কী?

কিশোরীদের প্রজনন-স্বাস্থ্য সেবা হচ্ছে তাদের প্রজনন-স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে প্রতিরোধ ও সমাধান করার জন্য কিছু পদ্ধতি, কৌশল ও সেবাসমূহের সমাহার, যা প্রজনন-স্বাস্থ্য ও কল্যানের জন্য সহায়ক।

তাহলে জেনে রাখো শিশু বয়স থেকেই প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা শুরু হয়। যার জন্য শিশু বয়সে বিশেষ যত্ন নিতে হয় ও বয়ঃসন্ধিকালে তা বাড়াতে হয় এবং প্রজননক্ষম সময় ও পরবর্তী সময়ে এই সেবার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

মেয়েদের প্রজননতন্ত্র কী ?

এ হচ্ছে সেই সমস্ত অঙ্গের সমষ্টি, যেগুলো সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মেয়েদের প্রজননতন্ত্র বা স্ত্রী প্রজননতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

ক. বহিঃপ্রজনন অঙ্গ, যা বাইরে থেকে দেখা যায়।

খ. অন্তঃপ্রজনন অঙ্গ, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

নিম্নে প্রজনন অঙ্গগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

ওভারি বা ডিম্বাশয় : তলপেটের দুই পাশে দুটো ডিম্বের থলি আছে ? এই থলি দুটিকে ওভারি বা ডিম্বাশয় বলে। ডিম্বাশয়ে অপরিপক্ব ডিম্বাণু জমা থাকে, প্রতিটি মেয়ে যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়, তখন প্রতি মাসে এই ডিমের থলিতে একটি করে ডিম বড় হয়। এখানে হরমোনও তৈরি হয়।

জরায়ু: দুই ওভারি বা ডিম্বাশয়ের মাঝখানে, তলপেটে একটি জরায়ু (বাচ্চাদানি) আছে। এটি ত্রিকোণাকৃতির হয়। জরায়ুর নিচে সিলিন্ডার আকারের ছোট একটি অংশকে জরায়ুর মুখ বা কারভিক বলা হয়। এই জরায়ুতেই মাসিকের রক্ত তৈরি হয় এবং এখানেই শিশু বড় হয়।

ডিম্বানালি: জরায়ুর ওপরের দিকে দুই পাশ থেকে দুটি নালি শুরু হয়ে ওভারি বা ডিম্বাশয়ের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ নালি দু'টিকে ডিম্ববাহী নালি বা ফ্যলোপিয়ন টিউব বলে। ডিম্বাশয়ের কাছে এই নালির আঙুলের মতো অংশকে বলে ফিমব্রিয়া। প্রতি মাসে ডিম্বাশয়ে যখন একটি করে ডিম পাকে, তখন তা এই নালি দিয়ে জরায়ুতে আসে। এখানেই শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়।

যোনি পথ : জরায়ুর নিচেই মেয়েদের বাচ্চা হওয়ার রাস্তা বা যোনি পথ আছে। এ যোনি পথ জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং নিচের দিকে ছোট একটি ছিদ্র হয়ে বাইরে এসে শেষ হয়। এই যোনি পথের অনেক কাজ রয়েছে। যেমন: এ পথ দিয়েই মাসিকের রক্ত বের হয়, যৌনমিলন হয় এবং সন্তান প্রসব হয়। এ পথের ঝিল্লি ভাঁজ-ভাঁজ থাকে। এখানে যে নিঃসৃত হয়, তার প্রকৃতি অম্লীয় এবং এই অম্লীয় যোনি পথের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে । কিন্তু মাসিক এবং প্রসবের সময় এই পরিবেশে পরিবর্তন হয়, নিঃসরণের প্রকৃতি বদলে ক্ষারীয় হয়ে যায়। এ জন্য এ সময় সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই এই সময় ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। মেয়েদের দেহের নিচের দিকে যোনি পথের মুখ ছাড়াও আরো দুটি ছিদ্রপথ আছে যোনি পথের সামনের ছিদ্রটি মুত্রনালির মুখ এবং পিছনের ছিদ্রটি পায়ু পথের মুখ।

প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব :

অসচেতনতার ফলে অনেকেই প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কখনো আবার লজ্জাকর ব্যাপার মনে করে প্রায় সবটাই গোপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু মনে রাখবে, সুস্বাস্থ্যের জন্য কিশোরীদের প্রজনন-স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমাদের দেশে প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবাকে কতটা অবহেলা করা হয়, তা কিছু তথ্য দিলেই বুঝবে।

এখনো আমাদের দেশে প্রতিবছর ১২ থেকে ১৫ হাজার মা মৃত্যুবরণ করেন সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে। মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে ১৭৪ জন। এই হার পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এ ছাড়া প্রসবজনিত জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে একজন নারীর মৃত্যু হলেও কমপক্ষে আরও ১৬ জন নারী এসব জটিলতা থেকে সৃষ্ট অসুস্থতা ও পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকেন। এখনো আমাদের দেশের মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৫ দশকি ৮। প্রায় ৭০ শতাংশ নারীরা ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান ধারণ করে থাকেন। ৬৮ শতাংশ নারী গর্ভাবস্থায় একবার মাত্র গর্ভকারীন পরিচর্যা এবং ২৬ শতাংশে কম নারী চারবার গর্ভকালীন পরিচর্যা গ্রহণ করে থাকেন এবং মাত্র ২৬ দশমিক ৫ শতাংশের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্যে ডেলিভারি হয়। এ ছাড়া প্রায় ৭০ শতাংশ 'মা' আমদেরা দেশে অপুষ্টিতে ভোগে। এসব জানা সত্ত্বেও কি আমাদের উচিত, এ বিষয়কে লজ্জা বা অবহেলা করা? অবশ্যই না। অবশ্যই প্রজনন-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন এবং মাতৃমৃত্যুর হার রোধ ও সুস্থ স্বাভাবিক মানবসম্পদ গড়ে তুলতে প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রজনন-স্বাস্থ্যের কোন কোন উপাদানসমূহের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত, তা জানা জরুরি।

সেগুলো হলো:

- কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্যসেবা
- নিরাপদ মাতৃত্ব
- পরিবার পরিকল্পনা
- প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ
- যৌনবাহিত রোগ ইত্যাদি

এসবের পাশাপাশি যৌন ও প্রজনন-স্বাস্থ্যবিষয়ক অধিকার সম্পর্কেও জানতে হবে।

প্রত্যেকের যৌন ও প্রজনন-স্বাস্থ্যবিষয়ক ১২টি অধিকার রয়েছে। অধিকারগুলো হচ্ছে:

১. প্রত্যেকের বাঁচার অধিকার রয়েছে। গর্ভজনিত কারণে কোনো নারীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করা যাবে না।

২. প্রত্যেক নারী ও পুরুষেরই স্বাধীন ও নিরাপদ যৌন জীবন উপভোগ করার ও প্রজননক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রয়েছে। জোর-জবরদস্তি করে গর্ভধারণ, বন্ধ্যাকরণ বা গর্ভপাত করানো যাবে না।

৩. যৌন নির্যাতন, প্রজনন-স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষের সমতা এবং সব ধরণের বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার।

৪. যৌন ও প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে পছন্দ ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার।

৫. প্রজনন-স্বাস্থ্য বিষয়ে মুক্ত চিন্তার অধিকার। অপব্যাখ্যা ও গোঁড়ামির প্রভাবমুক্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা পাওয়ার অধিকার।

৬. ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রজনন-স্বাস্থ্য বিষয়ে জানা ও শেখার অধিকার।

৭. বিবাহ কিংবা পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার।

৮. সন্তান গ্রহণ করা এবং করলে কখন, কয়টি সন্তান-এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।

৯. স্বাস্থ্য পরিচর্যা কিংবা সুরক্ষার অধিকার।

১০. বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ পাওয়ার অধিকার। উন্নততর প্রযুক্তির ফলে প্রাপ্ত নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য যৌন ও প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার

১১. প্রজনন-স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নীতিনির্ধারক বা সরকারকে প্রভাবিত করার অধিকার ।

১২. অপবহরণ, অপব্যবহারসহ যৌন নির্যাতন থেকে কিশোর-কিশোরীকে রক্ষা করতে তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং অন্যদের যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ থেকে রক্ষা করার অধিকারসহ কুচিকিৎসা বা অপচিকিৎসা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার।

এত কিছু জানার পরও কি আমাদের প্রজনন-অঙ্গের যত্ন নেওয়া উচিত না ? অবশ্যই উচিত। তাহলে কীভাবে যত্ন নিতে হবে ? যেমন সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত গোসল, পরিষ্কার সূতি কাপড় পড়া, উরুর দু-পাশ, যৌনাঙ্গ ও তার আশপাশ শুকনো রাখা ইত্যাদি।

প্রসবের পর মা ও শিশুর যত্ন

সন্তান জন্মের পর মা ও শিশুর উভয়ের শরীর দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ থাকে ? তাই এ সময়ে উভয়েরই বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। শুধু প্রসবকালীন যত্নই না প্রসবের পরও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। মনে রাখবে, সন্তানের প্রসবের পরে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে প্রসব পরবর্তী কাল বলা হয়।
কারণ সঠিক যত্ন নিলে প্রসূতি মা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং নবজাতক সুস্থ ও সবল থাকবে।

প্রসবের পর প্রসূতি মায়ের যেসব সেবার প্রয়োজন, তা অবশ্যই জানা উচিতঃ

- প্রসবের পর প্রসূতি মাকে বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার ও পানি খাওয়াতে হবে।
- প্রসূতি মাকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে হবে এবং ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সেই সঙ্গে যথেষ্ট ঘুমও দরকার
- প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে মাকে উৎসাহিত করতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রসবোত্তর ৪২ দিনের মধ্যে প্রসূতি মাকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।
- প্রসূতি মাকে মানসিকভাবে শান্তিতে রাখতে হবে।
- প্রসবের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রসূতি মাকে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে বাড়ি বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবোত্তর সেবা প্রদানের মাধ্যমে একই সঙ্গে মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি কমিয়ে আনা যায়।
- প্রসবোত্তর জটিলতা প্রতিরোধে অন্ততপক্ষে মাকে তিনবার (প্রসবোত্তর তিন দিন, সাত দিন এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যে) শারীরিক পরীক্ষা করাতে স্যাটেলাইট ক্লিনিক, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অথবা বেসরকারি ক্লিনিকে সেবা নিতে যেতে হবে।

মায়ের যত্ন : প্রসবের পর মায়ের প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া হলে মা সুস্থ থাকে এবং শিশুর যত্ন নিতে পারে। তাই নিচের বিষয় গুলো গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখবে।

বিশ্রামঃ প্রসবের পর মায়ের শরীর খুব ক্লান্ত থাকে। তাই সেদিন সারা দিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। পরের দিন থেকে একটু একটু করে চলাফেরা করতে পারে। যথেষ্ট ঘুম হলে মায়ের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

খাবারঃ এ সময় নিজের সুস্থতার জন্য এবং শিশুর বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়। প্রসবের পর সব ধরনের খাবার, যেমনঃ ভাত, ডাল, মাছ, ডিম, মাংস, দুধ, দুধ দিয়ে তৈরি খাবার, সবুজ ও হলুদ শাকসবজি ও প্রতিদিন যেকোনো মৌসুমি ফল খাওয়া প্রয়োজন। এ সময় প্রচুর ফোটানো বা নিরাপদ টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে এবং রান্নায় আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, এ সময় খাবারে কোনো বাছবিচার না করে সব ধরনের খাবার খেতে হবে।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। প্রতিদিন হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হবে ও রোদে শুকানো পরিষ্কার কাপড় পরতে হবে। পরিষ্কার কাপড়, তুলা বা প্যাড ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যবহৃত প্যাড বা কাপড় সময়মতো বদলে ফেলতে হবে।

স্তনের যত্নঃ শিশুকে সঠিক নিয়মে বার বার বুকের দুধ দিতে হবে। ঘন ঘন সঠিক নিয়মে দুধ না খাওয়ালে শিশুর পেট ভরবে না, কান্নাকাটি করবে, স্তনের দুধ চুষতে আগ্রহী হবে না। এ ছাড়া সঠিক নিয়মে না

খাওয়ালে স্তনের বোঁটা ফেটে যেতে পারে ব্যথা হতে পারে, কখনো কখনো ফোঁড়া পর্যন্ত হতে পারে। সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর পর স্তনের বোঁটা মুছে পুরিষ্কার রাখতে হবে।

ব্যায়াম: প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম বা কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করলে শরীর সুস্থ বোধ হয়, আরাম লাগে বাচ্চা হওয়ার প্রথম দুই সপ্তাহ সকাল ও বিকেলে আধ ঘন্টা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা দরকার। এতে জরায়ু তাড়াতাড়ি আগের অবস্থায় ফিরে দেতে সাহায্য করে।

জরায়ু সংকোচনজনিত ব্যাথা: প্রসবের পর জরায়ু সংকোচনের জন্য তলপেটে ব্যথা হয়। এই ব্যথা স্বাভাবিক। শিশুকে বারবার বুকের দুধ দিলে জরায়ু তাড়াতাড়ি সংকুচিত হয়।

স্বামী সহবাস: প্রসবের পর ছয় সপ্তাহ স্বামী-সহবাস থেকে বিরত থাকা উচিত। না হলে জরায়ুতে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

ভিটামিন 'এ' : শিশু মায়ের দুধের মাধ্যমে ভিটামিন 'এ' পায়। শিশুর দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকার জন্য এ সময় সব প্রসূতি মাকে বাচ্চা হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে একটি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (২ লক্ষ আইইউ) খাওয়াতে হয়। এই ক্যাপসুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কিছু কিছু এনজিও ক্লিনিকে পাওয়া যায়।

শিশুর যত্ন:

সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে করণীয় কী, সেই সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি। কারণ অনেক সময় শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রয়োজনীয় যত্নের অভাবে অসুস্থ হয়ে পরে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের বুকে দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে, শিশুকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার কাপড়ে জড়িয়ে নিতে হবে, যাতে সে উষ্মতা পায় এবং ঠান্ডা না লাগে। তাকে পরিষ্কার কাপড়ে শুইয়ে দিয়ে নাড়ি বেঁধে কেটে দিতে হবে। এ ছাড়া নবজাতক শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজ থেকে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে কিনা বা দেরিতে শ্বাস নিচ্ছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে।

শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিচে উল্লেখিত লক্ষণসমূহ দেখা জরুরি :

- শিশু আদৌ কাঁদছে কি না বা খুব আস্তে কাঁদছে ?
- শিশু নিজ থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে কি না বা শ্বাসপ্রশ্বাস খুব ক্ষীণ কি না ?
- শিশুর হৃৎস্পন্দন হচ্ছে কি না বা খুব আস্তে হচ্ছে (প্রতি মিনিটে ১০০ বা তার কম) কিনা ?
- শিশুর শরীরের রং নীল হয়ে যাচ্ছে কি না ?
- শিশু নড়াচড়া করছে কি না ?

মনে রাখতে হবে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে শিশুকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে।

শিশুর জন্য মায়ের বুকের দুধ

শিশুর জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এ সময় বুকের দুধ ঘন ও হলুদ রঙের থাকে, জেনে রাখো এই দুধকে শাল দুধ বলে। কিন্তু অনেকে এ দুধ ভালো নয় মনে করে শিশুকে খাওয়াতে চায় না। তবে শাল দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই শালদুধ প্রকৃতির বিশেষ উপহার যা শিশুর প্রথম টিকা। এ দুধে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর ও রোগ প্রতিরোধের পদার্থ থাকে। যেসব শিশু শাল দুধ খায়, তাদের ডায়রিয়া, হাম, সর্দি, কাশি ইত্যাদি কম হয়। এছাড়া শালদুধ নবজাতকের পরিপাক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং শিশুর প্রথম মল 'মিকোনিয়াম' নিঃসরণে সহায়তা করে।

শিশুকে কতদিন পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত ?

বাচ্চার জন্মের পর থেকে পূর্ণ দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত। বাচ্চার জন্মের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ দেওয়া উচিত। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধই হচ্ছে শিশুর আদর্শ খাবার। বাচ্চা যত ঘন ঘন বুকের দুধ খাবে, মায়ের বুকের দুধ তত বেশি তৈরি হবে। গরম ও শুকনা আবহাওয়াতেও মায়ের বুকের দুধে শিশুর শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পানি থাকে। পিপাসা মেটানোর উদ্দেশ্যে শিশুকে এই সময় পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। শিশুর চাহিদা অনুযায়ী যখন এবং যতক্ষণ চায় তাকে বুকের দুধ দিতে হবে। শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর থেকে ২ বছর পর্যন্ত বুকের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি সুষম পরিপূরক খাবার খাওয়াতে হবে। যেমন-সবজি, খিচুড়ি, ডিম, কলা, মিষ্টিকুমড়া, ডাল, লালশাক, সুজি ইত্যাদি। তবে এক বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য খাবার দেওয়ার আগে প্রতিবার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

বুকের দুধে প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও ক্যালসিয়াম থাকে, যা শরীর, হাড় ও দাঁত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বুকের দুধের প্রথম দিকে জলীয় অংশ এবং পেছনের দিকে চর্বিযুক্ত অংশ থাকে । শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য চর্বিযুক্ত দুধের একান্ত প্রয়োজন, আর দুই বছর পর্যন্ত শিশু খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়, তাই এ সময়ে মায়ের বুকের দুধ খুবই দরকারি।

শিশুর সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে :

- বাচ্চার জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে শালদুধ এবং প্রথম ৬ মাস শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
- ৬ (১৮০ দিন) মাস পর অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি ২ বছর পর্যন্ত বুকের দুধ দিতে হবে।
- শিশুর জন্মের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই শিশুর ওজন নিতে হবে এবং জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করতে হবে।
- সন্তান জন্মের ৬ সপ্তাহ পর ৬টি মারাত্মক রোগ, যেমন: যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হাম ও পোলিও রোগের টিকা দিতে হবে। এক বছরের মধ্যে সব কটি টিকা দেওয়া শেষ করতে হবে।
- শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্য অনুয়ায়ী পরিমিত পুষ্টিকর ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বৃদ্ধি ঠিকমতো হচ্ছে কি না, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে তা নিয়মিত দেখতে হবে।

- এক থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রতি ৬ মাস পরপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, সময়মতো ঘুমানো, খেলাধুলা করা ব্যায়াম করা ইত্যাদি প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
- রাতকানা ও অন্ধত্ব প্রতিরোধে প্রতিদিন গাঢ় রঙিন শাকসবজি, হলুদ ও লাল ফলমূল খাওয়াতে হবে। শাকসবজি রান্নাতে বেশি করে তেল দিতে হবে।
- জন্মের পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে শিশুর ওজন নিতে হবে। যদি পর পর ২ মাস শিশুর ওজন না বাড়ে তবে বুঝতে হবে তার কোন সমস্যা আছে। এ জন্য স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।
- সুস্থ শরীর ও উন্নত মেধার জন্য শিশুকে নিয়মিত আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়াতে হবে।
- শিশুর খাবার তৈরির আগে, খাওয়ানোর আগে নিজের এবং শিশুর হাত সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

কিশোরী বয়সে যৌন সম্পর্ক ও সাবধানতা

আধুনিক বিশ্বে নতুন যে প্রজন্ম সমাজে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে তারা প্রত্যেকেই সব কিছু খুব তাড়া তাড়ি জেনে নিতে আগ্রহী। তাই যৌনতা নিয়েও তারা কৌতূহলী। সম্প্রতি কম বয়সে যৌন সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণা করা হয়। এই গবেষণা থেকে উঠে এসেছে নতুন কিছু তথ্য, যেমন ধরো: সেক্স শব্দটা শুনলেই কম-বেশি সকলের মনেই একটা অদ্ভূত অনুভূতি জাগে।

তবে কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা এতে আকৃষ্ট হতে পারে। যদি এদের উচিত শিক্ষা না দেয়া হয় তবে এদের মধ্যে বিপথে যাওয়ার আশংকা বেড়ে যেতে পারে। বেশির লোকেই জানেন না যে, বাংলাদেশ সেই দেশগুলির মধ্যে একটি যেখানে নাবালিকা গর্ভবতীর সংখ্যা নিহাৎ কম নয়। আর এটা জেনেও আশ্চর্য হওয়ার কথা নয় যে সেখানে বেশির ভাগ কিশোরীর মেয়েই বিবাহিত।

বাবা-মা যখন জানতে পারেন যে, তার কিশোরী সন্তান সহবাসে লিপ্ত তখন তারা হয় তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নয়তো সব জেনে-বুঝেও চুপ করে থাকেন। কেবল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাবা-মা তাদের সন্তানদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের শিক্ষিত করে তোলেন।

বেশির ভাগ লোকই তাদের সন্তানদের সামনে নিজের স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করতে অস্বস্তি বোধ করেন। মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যে যৌনতা নিয়ে খুব সীমিত আলোচনা হতেই দেখা যায়। বোধহয় এই কারণেই কৈশোরের একটি বড়ে সংখ্যা দোটানায় জীবন কাটায় ও যখন বাবা-মা তাদের যৌন জীবন সম্পর্কে জানতে পারেন তখন ঠিক কী করা উচিত তা বুঝতে পারেন না।

আদতে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এই বিষয়টি তখনই গম্ভীর হয়ে ওঠে, যখন একজন কিশোরী অল্প বয়সেই সমস্ত কিছু জানতে ও হাতের নাগালে পেতে চায়। কম বয়সে একজন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পরিপূর্ণ হয় না। এই সময় সন্তানকে বোঝানোর দায়িত্ব অভিভাবকদের ওপরেই থাকে।

একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কোন বয়সের কিশোর-কিশোরীরা ইন্টারনেটে অশ্লীল তথ্য দেখতে শুরু করে?

ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মনো চিকিৎসক গবেষণা করে জানিয়েছেন ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সেই বেশির ভাগ কিশোর ইন্টারনেটে অশ্লীল তথ্য দেখতে শুরু করে। এবিসির একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের ভারতীয় মনোবিজ্ঞানী রাজ সিথার্থন ও তার স্ত্রী গৌমতি সিথার্থন প্রায় ৮০০ জনের ওপর একটি পরীক্ষা করেছেন। এই গবেষণা অনুযায়ী ইন্টারনেটে যারা অশ্লীল সাইট দেখেন তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ পুরুষ।

তারা জানাচ্ছেন যে এই বয়সে শারীরিক গঠন পুরোপুরি বিকশিত না হওয়ায় যৌন সম্পর্কের ফলে শারীরেও ব্যপক প্রভাব পড়তে পারে। এমনও জানা গিয়েছে যে, কম বয়সে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানসিক অবসাদ আসতে পারে। এছাড়া ও এতে মস্তিষ্কের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

কিশোরী বয়সে যৌন সম্পর্ক সচেতন না হলে আমাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এমনকি সামাজিক জীবনে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে সমাজ দেখা দেয় নানা মূল্যবোধের অবক্ষয়।

সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

- ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়
- মানুষ একজনের প্রতি আর একজন বিশ্বাস হারাচ্ছে।
- বাড়ছে পারিবারিক কলহ, ঘটছে অনেক দাম্পত্য জীবনের অবসান।
- সমাজের কোমলমতি শিশুরা বেড়ে উঠছে এক অশ্লীল পরিবেশে যা তাদেরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করছে।
- বাড়ছে দোষীদের আত্মহত্যার হার। তাদের অনেকে অবৈধ মেলামেশার পর প্রত্যাখাত হয়ে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ
- এছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।
- মারাত্মকভাবে বাড়ছে ইভটিজিং-এর হার।
- তরুণ-তরুণীদের এসব অবৈধ, অশ্লীল ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের ফলে বেড়ে চলেছে পথশিশুর হার।

তাদের অবৈধ মেলামেশার ফসল তারা ফেলে যায় বিভিন্ন জায়গায়। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি চরম সত্য।

আমরা বাঙালিরা শুধুমাত্র যারা খারাপ কাজ ঘটায় তাদেরকে একতরফাভাবে দোষী সাব্যস্ত করি এবং ছি ছি করতে থাকি। বলতে থাকি, দেশটা রসাতলে গেল, সমাজটা নষ্ট হয়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে গেল।এটা ঠিক না, এভাবে কখনো সমস্যার সঠিক সমাধান করা যায় না। সমস্যার সঠিক সমাধান করতে হলে আমাদেরকে সমস্যার সঠিক কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোর সমাধান বের করতে হবে। তবেই আমরা পারব আমাদের দেশকে, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র এবং আমাদের প্রাণ-চঞ্চল তরুণ-তরুণীদেরকে অবৈধ, অশ্লীল ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত করতে।

কিশোর-কিশোরীরা অবৈধ, অশ্লীল ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন কারণে এবং মাধ্যমে। সেগুলো হলো

- ধর্মীয় অনুশাসনের অবমাননা।
- আমাদের সংস্কৃতি বহির্ভূত বিভিন্ন অপসংস্কৃতির প্রভাবে।
- বাবা-মায়ের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা।
- ছেলে-মেয়ে কোথায় যায়, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে ঠিকমতো যাচ্ছে কি না, নাকি ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছে, মোবাইল ফোনে কার সাথে কথা বলছে, ছেলে মেয়েরা অশ্লীল

পোশাক পরে বাইরে যাচ্ছে কি না, ছেলে-মেয়ের বিয়ে করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা ইত্যাদি অনেক বাবা-মা খেয়াল রাখেন না।

- মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা এবং অপব্যবহার।
- মোবাইল ফোন সহজলভ্য হওয়ায় এবং এটি ব্যবহারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায়।
- খারাপ বন্ধুবান্ধবদের কুপ্ররোচনা।
- কুপ্ররোচনা আমাদের তরুণ-তরুণীদেরকে, অবৈধ, অশ্লীল ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে ফেলছে।
- সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা।

কোথায় তরুণ-তরুণীরা অবৈধ মেলামেশা করছে সেসব জায়গা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্তরা জানে। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয় না। এ ব্যপারে সরকারেরও মাথাব্যাথা থাকতে হবে।

এ ক্ষেত্রে সাবধানতার উপায় সমূহ ঃ

- নিজেদের মাঝে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে, তা মেনে চলতে হবে এবং অন্যকে তা মানতে উৎসাহিত করতে হবে।
- আমাদের সংস্কৃতি বহি:র্ভূত বিভিন্ন অপসংস্কৃতির/অশ্লীল মিডিয়া বন্ধ করে দিতে হবে।
- বাবা-মাকে ছেলে-মেয়েদের প্রতি সজাগ এবং দায়িত্বশীল হতে হবে।
- মোবাইল ফোন ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- খারাপ বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকতে হবে। ভালো বন্ধুবান্ধবদের সাথে সময় কাটাতে হবে।
- সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দায়িত্তপ্রাপ্তদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- নিজেকে সবসময় ভালো কাজের সাথে যুক্ত রাখতে হবে।
- সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায় নিয়ে লেখালেখি এবং আলোচনা করতে হবে।

অবশেষে বলতে চাই সুখী, সুন্দর সমাজ গঠনে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। একটি শালীন ও সুখী সমাজ আমাদের সকলের কাম্য। যদি আমরা সমাজের এই ভয়ানক ব্যাধিকে দূর করতে না পারি, তাহলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

আত্মহত্যা ঃ কারণ ও প্রতিকার

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ কিংবা উন্নত বিশ্বে হরহামেশাই বেড়েই চলেছে আত্মহত্যার প্রবণতা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত নানা কারণে মৃত্যু মিছিলে যোগ হচ্ছে অসংখ্য নব প্রাণ আর ক্ষতি হচ্ছে প্রত্যেক পরিবার ও রাষ্ট্রের কারণ প্রত্যেক মানুষই রাষ্ট্রের মানব সম্পদ। বাংলাদেশে নানা কারণে বেড়েই চলেছে আত্মহত্যার প্রবণতা বিশেষ করে উঠতি বয়সে কিশোর ও কিশোরীরা। কাজেই আমাদের উচিত জীবন সম্পর্কে যারা হতাশ তাদেরকে মানসিকভাবে সহযোগিতা করা। যাতে তারা জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে পারে এবং স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

আত্মহত্যা কী?

নিজেকে নিজে হত্যা করাই হলো আত্মহত্যা, আত্মহননই হলো আত্মহত্যা। বিশ্বে মৃত্যুর ১০ম কারণ হলো আত্মহত্যা। মোট আত্মহত্যার বড় অংশ হলো মহিলা ও কিশোরী। কিশোরীরা মূলত প্রেম কিংবা ভালোবাসার কারণে আত্মহননের পথে ধাবিত হয়। বিভিন্ন কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে সেগুলোর মধ্যে বিষণ্নতা ও মানসিক সমস্যা অন্যতম। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, ৪৬% আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে মানসিক বিষণ্নতার কারণে, আমাদের দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের ছেলে-মেয়েদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি যার হার ৭৬.৬১%, যার মধ্যে গলায় দড়ি ও ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যার হার বেশি।

আত্মহত্যার কারণগুলো ঃ

একজন মানুষ কেবল তখনই আত্মহত্যা করতে উদ্ধত হয় যখন তার নিরাশা চরমে পৌছায়; যখন আশার কোনো আলো তার হাদয়ে অনুভূত হয় না; অর্থাৎ যেসব মূল্যের ভিত্তিতে সে এতদিন অস্তিত্বে ছিল; এখন তা আর অবশিষ্ট নেই; এখন তার বেচেঁ থাকার কোনো অর্থ নেই। আমাদের চারিপাশে নানা সামাজিক সমস্যার কারণে দিনের পর দিন আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক কারণ সহ সচেতনতার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে ব্যক্তি আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হয়।

আত্মহননের প্রধান নিয়ামকগুলোর মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ সবচেয়ে বেশি দায়ী। তাহলে জেনে নিই এই কারণগুলো-

- যৌতুক প্রথা
- অসঙ্গতিপূর্ণ বিয়ে, তালাক, বহু বিবাহ
- অশিক্ষা ও অজ্ঞতা
- বেকারত্ব ও দারিদ্রতা /মৌলিক চাহিদা পূরণের অভাব
- উচ্চাকাঙ্ক্ষা /রোমাঞ্চকর অভিযানের অভিলাষ
- পাচার বিষয়ে সচেতনতার অভাব
- নারীর প্রতি লিঙ্গবৈষম্য
- পারিবারিক নির্যাতন (Domestic Violence)
- সামাজিক অঙ্গিকারের অভাব

সাধারণত মানুষ ৪টি কারণে আত্মহত্যা করে থাকে ঃ

১. যখন সমাজে সামাজিক সংহতি কম থাকে যেমনঃ পারিবারিক কলহ, পিতা-মাতার বিচ্ছেদ, অন্যের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে না পারা।

২. যখন সামাজিক সংহতি অতিমাত্রায় শক্তিশালী থাকে যেমনঃ খুদিরামের ফাঁসি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, আত্মঘাতী হামলা, জঙ্গিবাদী কার্যক্রম ইত্যাদি

৩. ব্যক্তি যখন তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় যেমনঃ তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা, দারিদ্র, নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে না পারা প্রভৃতি।

৪. পরিবার বা সমাজে অতিরিক্ত নিয়ম-কানুন চর্চার ফলে; যেমনঃ বাবা-মায়ের কঠোর শাসন, সমাজের কোনো বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত নিষেধ-বারণ ইত্যাদি।

কী কী উপায়ে আত্মহত্যার প্রবণতা কমানো যায় ঃ

১. পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে, পরিবারে শিশু কিশোরদের প্রতি যত্নবান হতে হবে, সাধারণত দেখা যায় যে, শহরে পিতা-মাতা তাদের ছেলে মেয়েদের সময় দেয় না, ফলে তারা বিষণ্নতায় ভোগে এবং আত্মহত্যার পথে ধাবিত হয়। শিশু কিশোরদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দিকে নজর দিতে হবে।

২. শিক্ষার হার বাড়ানোর পাশাপাশি শিশু কিশোরদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে।

৩. আত্মসচেতনতা বাড়াতে হবে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে হবে।

৪. বেকারত্ব দূর করতে হবে এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং আত্মহত্যার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

৬. সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার করার পাশাপাশি সমাজটাকে বদলাতে হবে।

৭. মেন্টর সিস্টেম চালু করতে হবে।

৮. শিশু-কিশোরদের নিয়ে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করতে হবে

সবাই সর্বোপরি নিজেকে ও নিজের পরিবারকে ভালোবাসতে হবে, নিজেকে ভালোবাসলে কখনো এই কাজটি করা যায় না। তাই মনে রাখবে, জীবন একটাই। সুতরাং কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নয়।

এসিড সন্ত্রাস: নৃশংসতা ও করণীয়

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই সহিংসতার সবচেয়ে বীভৎস রূপ সম্ভবত এসিড সন্ত্রাস। যদিও বলা হয়ে থাকে যে এসিড সন্ত্রাস কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশগুলোর জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় আসা এসিড সন্ত্রাসের খবর এখনও আমাদের সংকুচিত করে।

এসিড সন্ত্রাস বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। প্রতিনিয়ত নারীরা এসিড সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন। এসিড সন্ত্রাস দমনের জন্য কঠিন আইন থাকলেও এই আইনের ফলাফল খুব একটা ভালো না। পরিসংখ্যান বলছে, আমাদের দেশে এসিড সন্ত্রাসের পরিমাণ কমে আসছে। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রতিদিনের শিরোনামে দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার ঘটনা চোখে পড়ে।

বাংলাদেশে প্রথম এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে ১৯৬৭ সালে। তখনও সমাজে এসিড সন্ত্রাস ততটা মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। এরপর আবার এসিড সন্ত্রাস আলোচনায় আসে ১৯৯৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে। শামিমা নামক এক নারীর ওপর এসিড হামলা চালায় এক নরপশু। তখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর।

শামিমা বলেন, 'আমি এখন আর আয়না দেখি না। কিন্তু যখনই আমি আমার নাক অথবা কান স্পর্শ করি, তখনই মনের আয়নায় ওই দৃশ্য ভেসে ওঠে। এরপর থেকে বিভিন্ন সময় এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। এসিড সারভাইভাস ফাউন্ডেশনের হিসেবে, ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশে ৩ হাজারেরও বেশি এসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ২০০২ সাল। ওই বছর ৫০০ এসিড হামলার ঘটনা ঘটে।

এসিড সারভাইভাস ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০২ সালে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে ৪৯৪টি, ২০০৩ সালে ৪১৬টি, ২০০৪ সালে ৩২৬টি, ২০০৫ সালে ২২১টি, ২০০৬ সালে ১৮২টি, ২০০৭ সালে ১৬২টি, ২০০৮ সালে ১৪৩টি, ২০০৯ সালে ১২৫টি, ২০১০ সালে ১২০টি এবং ২০১১ সালে ৯১টি, ২০১২ সালে ৭১ টি এবং সর্বশেষ ২০১৩ সালে ৬৮ টি।

২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার এসিড সন্ত্রাস দমনে কঠোর আইন প্রণয়ন করে। অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের পাশাপাশি এসিডের ব্যবহার, মজুত ও বিক্রির ওপর কড়া কড়ি আরোপ করা হয়। এসিড নিক্ষেপকারীর জামিন নামঞ্জুর ও এক বছরের মধ্যে তাদের বিচার শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়, আগে যেখানে বছরের পর বছর লেগে যেত।

এসিড সন্ত্রাসের কারন ঃ

আমাদের দেশে এসিড নিক্ষেপ নারী নির্যাতনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হলেই মানুষ নামের নরপশুরা এসিড নিক্ষেপ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের অধিকাংশ এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে থাকে প্রেমঘটিত কারণে। আবার অনেক সময় যৌতুকের কারণেও এসিড ছোড়া হয়। বখাটে ছেলেরা অনেক সময় প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এসিড ছুঁড়ে নারীর মুখ ঝলসে দেয়। শত্রুতা করেও অনেকে মেয়েদের মুখে এসিড ছুড়ে মারে। কোনো সভ্য সমাজে এটা কল্পনাও করা যায় না। এসিডদগ্ধ নারী কোনোভাবে বাঁচতে পারলেও তাঁকে জীবন্মৃত অবস্থায়, মাথা নিচু করে কোনোভাবে দিনাতিপাত করতে হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো এসিড নিক্ষেপের ঘটনা সাধারণত নিম্নবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত

পরিবারের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে এবং নগরাঞ্চলে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে এর প্রভাব কম। এসিড নিক্ষেপের মতো নৃশংস অপরাধ নির্মূল করতে জনসচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। উগ্র ও ধ্বংসাত্মক এ সন্ত্রাসের ভয়াবহতা থেকে আজকাল শিশু, বৃদ্ধ এমনকি পুরুষরাও রেহাই পাচ্ছে না। এ সন্ত্রাস রুখতে সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং এসিডের সহজলভ্যতা রুখতে হবেই।

এসিড সারভাইভার্সফাউন্ডেশন তথ্য মতে যেসব কারণে এরকম জঘন্য ঘটনা ঘটে সেগুলো হলো ঃ

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মতো পুরুষতান্ত্রিক দেশে নারীকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে কল্পনাই করা হয় না। তাই নারী অবদমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় সহিংসতার নানা ধরনকে। সে কারণেই দেখা যায় পেছনের পটভূমি যাই হোক না কেন যৌতুক থেকে শুরু করে পারিবারিক সহিংসতা, জমি/সম্পত্তি/টাকা সংক্রান্ত বিরোধ, বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ, প্রেম/বিবাহ/যৌন সম্পর্কে অসম্মতি সবক্ষেত্রে নারী ভুক্তভোগীর সংখ্যাই বেশি।

এসিড আক্রমণের ফলে নারীর জীবনের যা ঘটে ঃ

- নারী নির্যাতনের নৃশংসতম একটি ধরন হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ। এসিড সন্ত্রাসের পরিণতিতে একজন নারীর শারীরিক মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমরা বা অন্যরা এক্ষেত্রে শুধু সহানুভূতি জানাতে পারি। সমব্যথী হওয়া সম্ভব নয়। এসিড নামক রাসায়নিক এ দাহ্য পদার্থটির ভয়াবহতা এত ব্যাপক, যা চামড়ার নিচের টিস্যু, এমনকি হাড় পর্যন্ত গলিয়ে দেয়। এসিড সন্ত্রাসের যে কোনো ঘটনা মনুষ্যচেতনাকে আহত করে।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন (এএসএফ)-এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০১২ সালের শেষার্ধ্ব পর্যন্ত সারাদেশে ৩ হাজার ৮৬টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। আর এতে আহত হয়েছে অন্তত ৩ হাজার ৩৯২ জন। এদের প্রায় সবার নাক ও চোখসহ মুখমণ্ডল এবং শারীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মারাত্মকভাবে ঝলসে যাওয়ায় জীবন এক কষ্টকর উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। দুঃখজনক এ উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হলে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও দোষীদের শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

- এসিড সন্ত্রাসে ভুক্তভোগীর জীবনে যে যন্ত্রণা ও বিভীষিকার সৃষ্টি হয় তা অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি ও এসিড দগ্ধদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছে।
- এসিড সহিংসতা রোধে এসব আইন ও এ সংক্রান্ত বিধিমালা হলেও দেশে এসিড সন্ত্রাস সেভাবে কমেনি। এজন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা পর্যালোচনা করে আইনের যথার্থ সংশোধন বাংলাদেশের দণ্ডবিধি অনুযায়ী এসিড ছোঁড়ার শাস্তি হিসেবে রয়েছে সর্বনিম্ন ৭-১২বছরের জেল বা সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই আইন বিদ্যমান থাকলেও অনেক সময় আইনের অপর্যাপ্ততা ও প্রয়োগ না করার কারণে এসিড নিক্ষেপকারী দিব্যি ঘুরে বেড়ায়।
- বাংলাদেশে সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে এসিড আক্রান্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের কথা অবশ্যই বলা উচিত। তা হলো এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন(এ এস এফ)।
- এ এস এফের প্রতিষ্ঠার আগে এসিড হামলায় আক্রান্তদের চিকিৎসার ও পুনর্বাসন এবং এসিড সন্ত্রাসের প্রতিরোধের জন্য কোনো সমন্বিত উদ্যোগ ছিল না। ফলে বাংলাদেশে এসিড সন্ত্রাস ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করে। একজন এসিড আক্রান্তকে যতই সুযোগ-সুবিধা ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হোক না কেন, তাকে সাধারণ সমাজে সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ না করে দিতে পারলে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।
- এই প্রেক্ষাপটের এক পর্যায়ে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউনিসেফ প্রণীত একটি প্রতিবেদনে এসিড হামলায় আক্রান্তদের সাহায্য এবং পুনর্বার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রোধকল্পে এ ধরনের একটি ফাউন্ডেশন গঠনের সুপারিশ করা হয় এবং পাশাপাশি এর অপরিহার্যতার প্রতিও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
- এসিডদগ্ধ ও তাদের নিকট আত্মীয় স্বজনদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করা।
- আক্রান্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা।

এসিড সন্ত্রাস রোধের উপায়গুলো ঃ

- আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে আর কোনো নারী এসিড সন্ত্রাসের শিকার না হয়। এসিড সন্ত্রাস বন্ধে এবং এসিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সংগঠন এবং এককভাবেও অনেকে অবিরাম কাজ করে চলেছেন। এদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই আজ এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা কমতে শুরু করেছে। তবে এই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এসিড সন্ত্রাসের শেকড় পুরোপুরি উপড়ে ফেলতে হবে। আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এসিড সহিংসতায় যেমন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় নারী
- সমাজ, তেমনি এসিড আক্রমণকারীর সিংহভাগ হলো পুরুষ। এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা, আইনগত শাস্তি, পারিবারিক ও সমাজিক বিপর্যয়ের কথা যদি একজন পুরুষ কিশোর বয়সেই

জানতে পারে, তাহলে বড় হয়ে এসিড সন্ত্রাসী দানবে পরিণত হবার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

- মূলত কারখানার জন্য এসিড প্রয়াজনীয় একটি উপাদান হলেও আলু-পটলের মতো নির্বিচারে দেশের সর্বত্র এর কেনাবেচা চলছে। এছাড়া কিছু জেলার সীমান্ত এলাকায় চোরাইপথে আসা এসিড একটি সহজলভ্য পণ্যে পরিণত হওয়ায় যে কেউ খুব সহজেই তা সংগ্রহ করে মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলছে। লাইসেন্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কারো কাছে এসিড বিক্রি করার নিয়ম নেই। সমাজ থেকে এসিড সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সর্বাগ্রে এর ব্যবহার কঠোর নজরদারির আওতায় এনে তা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- দেশের প্রচলিত আইনে এসিড সন্ত্রাসের কঠোর শাস্তির বিধান থাকলেও তার প্রয়োগ নেই বললেও চলে। অপরাধীরা মামলার তদন্ত সংশ্লিষ্টদের প্রভাবিত করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার পেয়ে যায়। এ অবস্থার প্রতিরোধে এসিড সন্ত্রাসের তদন্ত ও বিচারের সময় নির্দিষ্ট করে দেয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্ত কর্তৃপক্ষের গাফিলতি থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও বিধান থাকতে হবে। এসিড সন্ত্রাসে জড়িতদের সাজা বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এর পাশাপাশি যৌক্তিক কারণ ছাড়া এসিড ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথাও ভাবা যেতে পারে।
- সরকার দেশি বিদেশি এনজিও এবং সুশীল সমাজের কল্যানে এসিড সন্ত্রাস দিনে দিনে কমছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে তাদের কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। তার মধ্যে এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন, এসিডদগ্ধদের আর্থিকভাবে সহায়তা করছে ও এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিদান আইনগত দিক থেকে এসিডদগ্ধদের জন্য লড়ছে ও নৈতিক সমর্থনও দিয়ে যাচ্ছে। এসিড সন্ত্রাস পুরোপুরি নির্মূল করতে এ ধরনের এনজিওগুলোর কর্মপরিধি আরও বাড়াতে হবে।

পানি ও রোগ

পানির অপর নাম জীবন। কিন্তু জেনে রাখো, এই জীবনই আবার হতে পারে তোমার মরণের কারণ। কীভাবে? দূষিত পানি পান করলে বা কোনো বিশেষ রোগের জীবাণু বহনকারী পানি পান করে তুমি হতে পারো মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত।

তোমরা কি জানো পানির দ্বারা সৃষ্ট যেসব রোগ রয়েছে সে সব রোগের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে? তাহলে এসো জেনে নিই যেমনঃ

- পানি হতে জন্মানো রোগ (Water-born Diseases)
- পানিভিত্তিক রোগ (Water-based Diseases)
- পানি-ধৌত রোগ (Water-washed Diseases)
- পানি সম্পর্কিত রোগ (Water-related Diseases)

পানি হতে জন্মানো রোগ (Water-born Diseases)

মানুষ বা জীবজন্তু, পশু-পাখি যখন কোনো পানিকে নানাভাবে নোংরা করে তখন পানিতে জন্ম নেয় রোগ জীবাণু। এসব রোগের মধ্যে সাধারণত বেশি পরিলক্ষিত হয় - কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ডায়রিয়া পানিতে জন্মানো জীবাণু হতে সৃষ্ট রোগের উদাহরণ। এসবই হয় পানিতে জন্মানো নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে যা খালি চোখে সবসময় পরিলক্ষিত নাও হতে পারে।

আবার পানি হতে জন্মানো রোগের কারণ হিসেবে কল-কারখানার বর্জ্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। আর্সেনিক-এর মতো অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষ পানিতে এই কারখানা বর্জ্য নিক্ষেপের কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পানিভিত্তিক রোগ (Water-based Diseases)

সিসটোসোমিয়াসিস (Schistosomiasis), ড্রাকানকিউল্যাসিস (Dracunculiasis) ইত্যাদি পানিভিত্তিক রোগের নাম। ময়লা পানি পানের ফলে এ রোগগুলোতে মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকে।

পানি-ধৌত রোগ (Water-washed Diseases)

খোস-পাঁচড়া, বিভিন্ন ধরনের চুলকানি এবং ত্বকের আরও নানা ধরনের রোগ-বালাই হলো পানি ধৌত রোগের উদাহরণ। দরিদ্র শ্রেণি লোকজন মূলত এ রোগের শিকার বেশি হয়। কারণ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বেশি অসাবধান থাকে। দেখা যায় ডোবা, নালা বা মজা পুকুরের নোংরা পানিতে তারা প্রায়শই গোসল করে, জামা-কাপড় ধৌত করে, থালা-বাসন ইত্যাদি ধৌত করে।

পানি সম্পর্কিত রোগ (Water-related Diseases)

পানি সম্পর্কিত রোগগুলো সাধারণত কীট-পতঙ্গ বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণে হয়ে থাকে। ময়লা পানিতে এসব কীট-পতঙ্গ বা পোকা-মাকড়ের জন্ম হয়ে থাকে এবং ময়লা পানি থেকেই জীবাণু কীট-পতঙ্গ বা পোকা-মাকড়েরা নিজেদের শারীরে তা সংক্রামিত করে এবং তা আবার বিভিন্নভাবে মানুষকে সংক্রামিত করে। যেমনঃ মশা। মশার কারণে মানুষের শারীরে সৃষ্টি হয় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্বর (Yellow fever) ইত্যাদি রোগ।

এবার জানবে পানি দ্বারা সৃষ্ট রোগের সমস্যাসমূহ

- সংক্রামক রোগের ৮০ শতাংশই ছড়ায় পানির মাধ্যমে।
- প্রতি বছর বিশ্বে অর্ধকোটি মানুষ পানি দ্বারা সৃষ্ট রোগে মারা যায়।
- ২০ লক্ষ মানুষ মারা যায় শুধুমাত্র ডায়রিয়াজনিত রোগে।
- এসব মৃত মধ্যে শিশুদের সংখ্যাই বেশি।

এখন জানাবে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং নিবারণ করতে হবে ঃ

এক্ষেত্রে আমাদেরকে তিন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে একই সঙ্গে।

ক. সরকারি উদ্যোগ

খ. বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্যোগ

গ. ব্যক্তি উদ্যোগ

রোগের প্রকোপ কমাতে যে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে

- স্বাস্থ্যবিধি বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে হবে
- পুষ্টি বিষয়ক সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে
- উন্নত আবাসন গঠন প্রক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে
- পানি দ্বারা সৃষ্ট রোগ-বালাইয়ের ব্যাপারে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

এখন জানাব সাধারণ কিছু নির্দেশিকা ঃ

- মানব-মলমিশ্রিত মাটি যে কোনো ব্যবহারের ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলতে হবে
- যেখানে সেখানে মলত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- বাচ্চাদের মল এবং ডায়াপার ঠিকভাবে সঠিক জায়গায় ফেলতে হবে।
- খাবারে হাত দেবার আগে হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে
- দূষিত পানি ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে
- তরিতরকারি ঠিকভাবে ধুয়ে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সঠিকভাবে খোসা ছাড়িয়ে এবং সঠিকভাবে সিদ্ধ করে রান্না করতে হবে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিশোরী ও নারী

আমাদের দেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিলের প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় সেরকমই একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদাহরণ। যে দুর্যোগে মৃত্যু হয়েছিল ১, ৪০, ০০০ মানুষের। যার ৯০ ভাগই ছিল নারী। এরকম ঝড় হোক অথবা ভূমিকম্প বা অন্য আর যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়, জরিপ বলে এতে করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী ও কিশোরীরা।

আবার একটি পরিসংখ্যান বলে, এরকম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বড়দের চেয়ে কিশোর-কিশোরীদের মৃত্যুহার ১৪ গুণ বেশি। তবে দেশের কোথাও যখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন সবচেয়ে বেশি বিপদে থাকে কিশোরীরা। দুর্যোগের ভয়াবহতা স্বাভাবিকভাবেই মানুষ হিসেবে তাদের মাঝে একধরনের স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার করে। তদুপরি মরার ওপর খারার ঘা-এর মতো সম্ভ্রম হারানোর বিপদ তাদের ঘাড়ে চাপে। যার অপর নাম যৌন সহিংসতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত পরিস্থিতির ফলে যৌন সহিংসতা আদিকাল থেকেই ঘটে আসছে এবং এই অবস্থা বিশ্বময় আজও চলছে।

যৌন সহিংসতা কী?

যৌন সহিংসতা বলতে ধর্ষণ, ধর্ষণ-প্রচেষ্টা, যৌন শোষণ ও যৌন নির্যাতনসহ বিনা সম্মতিতে যৌন ধরনের কোনো কাজকে বোঝায়।

যদিও যৌন সহিংসতা স্বাভাবিক অবস্থায়, এমনকি শান্তিকালীন সময়ও ঘটতে পারে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংঘাতের সময় ধর্ষণ ও অন্যান্য ধরনের যৌন সহিংসতার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রামাণ্য প্রতিবেদন ও গবেষণায় এই ভয়াবহ বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য মানবসৃষ্ট

দুর্যোগ, যেমন - যুদ্ধ, সংঘাত, বাস্তুভিটা বা দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও নারী, বিশেষ করে কিশোরীদের অধিক পরিমাণে যৌন নির্যাতনে শিকার হতে দেখা যায়। কোনো জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ, মর্যাদাহানি, অপদস্থ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার কার্যকর উপায় হিসেবে এখনও অনেক সংঘাতে ধর্ষণকে যুদ্ধের একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

UISP-ইউএনএফপিএ-এর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম একটি হাতিয়ার হিসেবে এখন পরিগণিত হচ্ছে। এটি হচ্ছে আইএডব্লিউজি-এর ২০১০ ফিল্ড ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে গঠিত। যেখানে জরুরি পরিস্থিতির প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করে পুনর্গঠন ও উন্নয়নকাল পর্যন্ত বিপন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চাহিদা নিরসনের উপায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। বিশেষ করে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কিশোরীদের যৌন সহিংসতা রোধে ল্যাট্রিন ব্যবস্থা, বসবাসের স্থানের নিরাপত্তা, যেসব ব্যাপারে কিশোরী ও নারীদের সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে তার নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মাধ্যমে সেসব বিষয়ে সচেতনতার ব্যাপারে হাতে-কলমে শিখানো এবং জানানো। সঙ্গে গর্ভবতী নারীদের গর্ভাবস্থার সেবা এবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও নানা ধরনের নির্দেশনা এই MISP-তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সংকটকালে সকল নারীর প্রতি যৌন সহিংসতার ঝুঁকি থাকলেও কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই ঝুঁকি বেশি থাকে। কেননা যৌন শোষণ ও ধর্ষণের জন্য প্রায়শ তাদেরকেই টার্গেট করা হয়।

সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে যৌন সহিংসতা কারা ঘটায়? এরকম একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে চলে আসে ?

এরকম সংকটকালে যৌন সহিংসতা অন্য এমন ব্যক্তিরাও ঘটাতে পারে যারা নিজেরাও দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অথবা মানবিক কর্মী, আশ্রয়দাতাগোষ্ঠীর সদস্য, কমিউনিটি বা পরিবারের সদস্য। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল পরিবেশের সুযোগ যে কেউই নিতে পারে।

যৌন সহিংসতা সাধারণত যে সময়কালে ঘটে থাকে তা হলো

- পুনর্বাসিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সময়সহ বাস্তুচ্যুত থাকাকালে যে কোনো সময়। বলা হয়ে থাকে এসময় বাস্তুচ্যুত লোকদের মধ্যে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিতে।

যৌন সহিংসতার ঝুঁকি হ্রাসের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলো ঃ

- নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী ও শিশুরা যাতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ লাভ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভৌত নিরাপত্তা জোরদারের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্রের নকশা ও স্থান নির্ধারণ করতে হবে।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপত্তার বিষয়ে সেবাদানকারী ও রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপদ জায়গায় পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক ল্যাট্রিন ও গোসলখানা রাখতে হবে এবং সেগুলোতে রাতে পর্যাপ্ত আলো ও ভেতর থেকে লক করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সেবাদানকারীদের মধ্যে যাতে সকল জাতিগত সাব-গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে কিংবা দোভাষীর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নারী সেবা প্রদানকারী, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী, প্রোগ্রাম স্টাফ ও নারী দোভাষী নিয়োগ দিতে হবে।
- সেবাদানকারীদেরকে গোপনীয়তা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে এবং যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনবিরোধী আচরণ বিধিতে তাদের স্বাক্ষর প্রদান ও মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।
- স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত আচরণবিধি ও রিপোর্টিং পদ্ধতি চালু বা কার্যকর থাকতে হবে এবং এই বিধি লংঘনের জন্য যাতে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে তাও নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কিশোরী স্বাস্থ্যে পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী খাদ্য সংকট, বিশুদ্ধ পানি সংকট মানবজীবনের এক অবধারিত বিপর্যয় রূপে দেখা দেয়। যা এই পুষ্টির অভাব তৈরি করে থাকে। এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভুক্তভোগী হলেও কিশোরীদের ব্যাপারে এবং গর্ভবতী মায়েদের ব্যাপারে আমাদের একটু বেশি সচেতন হতে হবে। কারণ যে কিশোরী দুর্যোগের ফলে পুষ্টির অভাবে পড়বে সেই তো আগামী দিনের মা হবে। আর যে সেই দুর্যোগকালের সন্তানসম্ভবা সেই তো বলিষ্ঠ বাংলাদেশের ধারক। সুতরাং, সংকটকালে কিশোরী ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টির বিষয়টার দিকে একটু বেশি খেয়াল রাখতে হবে।

দুর্যোগকালে কিশোরীদের নিরাপত্তা দেবার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টার পরও যদি দৈবিকভাবে কোনো ক্ষতিসাধন হয়েই যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই ক্ষতিগ্রস্ত কিশোরীকে পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সেবা
প্রদানের মাধ্যমে সমাজিকভাবে তাকে কোনোভাবেই হেয়-প্রতিপন্ন হতে দেবো না। এ হোক আমাদের অঙ্গিকার।

কৈশোরঃ নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ

প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক এমনকি সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তর কিছু ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে। যেগুলো যুগের পর যুগ মানুষকে সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ ও সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করে।

'নৈতিক' কথাটি নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সকল ক্ষেত্রে সুনীতিই নৈতিক মূল্যবোধের নিয়ামক। ব্যক্তিজীবনে এবং সামাজিক জীবনে কোনো মানুষ কোনো কালেই সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততা লাভ করতে পারে না যদি তার মধ্যে না থাকে নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি শুভবোধ, সৎ চিন্তা, সততা, নির্লোভ জীবন পদ্ধতির সাথেও সম্পৃক্ত।

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ কী?

যে ব্যক্তি ব্যক্তিজীবনে সত্য কথা বলাকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারেনি তার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ আশা করা অসঙ্গত। পরোপকার করতে যার মন কাঁপে, লোভের বশবর্তী হয়ে যে অন্যের অধিকার হরণ করে তার মধ্যে সুনীতি আশা করা যায় না। সামাজিক জীবনে পরহিত কামনা করা, কল্যাণের পক্ষে অবস্থান নেয়া, সৎচিন্তা চর্চা করা, মিথ্যাকে পরিহার করে সত্য-সুন্দর-ন্যায়সঙ্গত জীবনের পক্ষে অবস্থান নেয়ার মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নৈতিক মূল্যবোধ তাই মানুষের অলংকার।

নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্বঃ

মানুষই সমাজকে উঁচুতে আসীন করে আবার মানুষের অনৈতিক কর্মকাণ্ডই কোনো সমাজকে ভরাডুবিতে পরিণত করে। নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ স্বভাবতই উচ্চ চরিত্রের হয়ে থাকে। তাই সৎ চরিত্রবান মানুষের প্রভাব পড়ে সমাজে। সমাজে দরকার আলোকিত মানুষ-যাঁরা নিজেরা আলোকিত এবং সমাজকেও আলোকিত করে। আর নৈতিক মূল্যবোধ যার প্রখর নয় সে তো আলোকিত মানুষ হবার কথা নয়। যে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ যত বেশি, সে সমাজ তত সুখী ও সমৃদ্ধশালী। সমাজে নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অভাব হলেসমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আর ন্যায়বিচার যেখানে অনুপস্থিত সেখানে শান্তি নির্বাসিত। তাই সমাজ জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণগুলো কী? ঃ

কোনো একটি বিশেষ কারণে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের পতন ঘটে না। নানাবিধ কারণে এ অবক্ষয়ের শিকার হয় মানুষ। সমাজ জীবনে চরম দারিদ্র্য, শিক্ষিত বেকারের কর্মহীনতা, ভোগবাদী মানুষের বিলাসী প্রতিযোগিতা, আপাত স্বার্থের লোভে পতিত হওয়া, জাতীয় জীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকা, ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে গুরুত্ব না দেয়া ইত্যাদি কারণেই মানুষ তার নৈতিক মূল্যবোধ হারায়। মানুষ যখন নৈতিক মূল্যবোধ হারায় তখন প্রকৃতপক্ষে তার উৎকৃষ্ট চরিত্রকেই হারায়।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রভাব ঃ

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলাফল হচ্ছে অসুন্দর সমাজ। সমাজ জীবনে অন্যায়, দূর্নীতি আর অনিয়ম নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়েরই ফল। মূল্যবোধ ভেঙে পড়লে সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। পেশিশক্তির প্রয়োগে ক্ষমতাবানরা ক্ষমতাহীনের ওপর উৎপীড়ন চালায় সহজেই। মানবসভ্যতা যখন চরম উন্নতির পথে ধাবমান তখন পরিতাপের হলেও স্বীকার্য আমাদের দেশে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে। বিশ্বজনের কাছে এ সংবাদ-জাতি হিসেবে আমাদেরকে গৌরবান্বিত করে না বরং আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ আজ কঠিন প্রশ্নের স্মুখীন। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলেই সমাজে দুর্বৃত্তের দল অন্যায় সংঘটনে সাহস পায়। চাঁদাবাজি, রাহাজানি ও অরুচিপূর্ণ বিনোদনে মানুষ মত্ত থাকে তখনই যখন মানুষের মূল্যবোধ থাকে না। একটি সমাজে বা জাতির জীবনে মূল্যবোধের এমন অবক্ষয় কাটিয়ে উঠতে না পারলে তারা নিক্ষিপ্ত হবে আস্তাকুঁড়ে। সভ্য জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে নৈতিক মূল্যবোধের এ পতনকে রুখে দিতে হবে।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে আমাদের করণীয় কী?

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করার দায়িত্বটি প্রথমে ব্যক্তি নিজে এবং পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। নিজে ব্যক্তিগতভাবে সুনীতি ও শুভবোদের চর্চার মধ্য দিয়ে পরিবার ও সমাজকে উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নীতিবোধসম্পন্ন দক্ষ জনপ্রশাসন

গড়ে তুলতে হবে। নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। দেশের জনগণকে উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সমাজে মূল্যবোধ জাগ্রত নিবেদিতপ্রাণ উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরষ্কারের মধ্য দিয়ে অন্যদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

একটি সুন্দর, কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের তাগিদ থেকে আমাদের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের জাগরণ জরুরি। সত্য, সততা ও ন্যায়কে আমরা হ্যাঁ বলব। জীবনে সকল পর্যায়ে সুনীতি, সুবচন ও শুভবোধ হোক আমাদের চর্চার বিষয়। তবেই আমরা উন্নীত হব সম্মানজনক সামাজিক জীবনে।

কৈশোর, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যে জানা-পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেই পারে। এই বয়সে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবেগদ ও চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আসে। দেখাশোনা ও আলাপের কোনো এক পর্যায়ে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। কখনো কখনো এটা সাধারণ বন্ধুত্ব থেকে বেশ গভীর পর্যায়ে যেতে পারে। অনেক সময় ভালো লাগা শেষ পর্যায়ে প্রেম ও ভালোবাসয় রূপ নিতে পারে।

একটি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা দোষের কিছু নয়। এ বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একপ্রকার আকর্ষণ অনুভব হয়। যার ফলে একে অন্যের সঙ্গে গল্প করতে চায়, আবার কারো কারো ভয় লাগে। তবে এতে ভয়ের কিছু নেই। আমাদের সমাজ ছেলে-ছেলে অথবা মেয়ে-মেয়ের বন্ধুত্ব যতটা না সহজে গ্রহণ করে, ঠিক একই ভাবে ছেলের সঙ্গে মেয়ের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা অনেকে সহজে মেনে নেয় না। একটি ছেলেও মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা দোষের কিছু নয়। তবে ছেলে ও মেয়ের বন্ধুত্ব শুধু বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ভালো। মনে রাখতে হবে যে গল্পের ফাঁদে ফেলে কোনো খারাপ সম্পর্ক যেন গড়ে না ওঠে এবং তা যেন কোনো ভাবেই শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত না গড়ায়। অনেক সময় ছোটবেলার বন্ধু বড় হয়ে প্রেম নিবেদন করতে পারে। এ বয়সে মন আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই এ সময় বন্ধুকে বন্ধু হিসেবেই দেখা উচিত। বড় হয়ে একে অন্যকে পছন্দ করতে বা ভালোবাসতেই পারো। তবে তা হতে হবে দুজনের সম্মতিতে। যদি ব্যাপারটা একপক্ষীয় হয়, তবে অন্যজনকে বুঝিয়ে বলতে হবে। একবারে বুঝাতে না পারলে বারবার বোঝাবে। তবে মনে রাখবে, ভয় বা জোর করে ভালোবাসা যায় না।

ভালো লাগার পরের পর্যায় ঃ

ভালো লাগার পরের পর্যায়ে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি হতে পারে। এ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। যেমনঃ চিঠি লিখে, উপহার দিয়ে, দেখা করে, হাত ধরে বা আরেকটু কাছে আসার ইচ্ছে কথা প্রকাশ করে। যাকে ভালো লাগে, তার কথা বারবার মনে পড়ে। তার হাসি তার কথা শুনতে ইচ্ছে করে। তার একটু দেখা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই অনুভূতি প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই সংযত থাকতে হবে। ভালো লাগার সম্পর্ক হতে হবে দুজনের সম্মতিতে, মার্জিত ও শালীনভাবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই যৌন অনুভুতিকে সংযত করে রাখতে হবে। আরেকটা ব্যাপার মনে রাখবে, ভালোবাসার কথাবার্তা ও সম্পর্ক যেন নিজেদের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকে। সেটা যেন সবার আলোচনার বিষয় না হয়। আর প্রেম করার ফলে লেখাপড়ার ক্ষতি যেন না হয় এবং সম্পর্ক যেন শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত কোনোভাবেই না গড়ায়, সেদিকে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।

ছেলেমেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালে কেন নিজেকে আকর্ষণীয় করতে চায় ?

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা নিজের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। হরমোনের কারণে এ বয়সে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো হয়। এ বয়সে মেয়েরা চায় ছেলেদের আকর্ষণ করতে। তেমনি ছেলেরা চায় মেয়েদের আকর্ষন করতে। এ সময়ে নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে ভালোবাসে। যেমন চুলের স্টাইল, কাপড়চোপড়ের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে ওঠো। কী, তাই না ? ঠিক বলেছি না ? মনে মনে ভাবছ

আসলেই তো এ রকম তো করি। কিন্তু আমরা তা জানলাম কী করে? তাই তো ?ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক। নিজের প্রতি হঠাৎ সচেতনতা থেকেই বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা অন্যের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়। আবার সহজেই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে ।

ভালোবাসা কী?

অনেকের মনেই ভালো লাগা কাজ করে, তবে ভালোবাসা কী, তা বুঝতে না-বুঝতেই মনে করা শুরু করে দেয় যে তুমি হয়তো কাউকে ভালোবাসো। তার আগে জানা উচিত ভালোবাসা কী? এটি এমন একটি সম্পর্ক যেখানে একজন আরেকজনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এ অনুভব হলেই পরস্পরকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। কৈশোর বয়সের এই আকর্ষণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুগ্ধতা, যা সাধারণত ক্ষণিকের জন্য হয় এবং খুব দ্রুতই তা উবে যায়। সত্যিকার ভালোবাসা হলো যখন একজন আরেকজনকে বুঝতে পারে, একজন আরেকজনের সবকিছু মেনে নিয়ে সব সময়ের জন্য কাছে পেতে চায়। এসব বিষয় মাথায় রেখেই ভালোবাসা গড়ে ওঠে।

দৈহিক সম্পর্ক :

আমরা জানি বয়ঃসন্ধিতে যখন একটি মেয়ে পৌঁছে, তখন তার মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন হতে থাকে। তখন সে যৌন উত্তেজনা অনুভব করতে পারে। এটা এ বয়সের স্বাভাবিক প্রকাশ। মনে রাখবে, নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে এতে সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম মেনে চলা অত্যাবশ্যক। অবৈধ যৌনমিলন তা যেকোনো বয়সেই হোক না কেন, এটা অনৈতিক এবং সমাজে তা গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই এ সম্পর্ক বৈধ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

কিশোর বয়সে একজন আরেকজনকে ভালো লাগতে পারে। কিন্তু এর সমাধান বিয়ে নয়। কারণ বিয়েটা শুধু দৈহিক সম্পর্কের জন্য নয়, বিয়ের সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, সন্তান জন্মদান এবং প্রতিপালন, সংসার চালানোর জন্য অর্থ উপার্জনসহ অনেক বিষয় জড়িত। অল্প বয়সে বিয়ে করে বাচ্চা হলে তা মা ও বাচ্চা দুজনের জন্যই ক্ষতিকর। তাই বিয়ের জন্য শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য পরিপক্বতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আমাদের দেশে আইনগত বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। সেটা মেয়েদের জন্য ১৮ এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর। তা ছাড়া যৌন উত্তেজনা অনুভবের বিষয়টি মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ধীরে ধীরে শরীরের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেলে তখন আর অসুবিধা হয় না। এই বিষয়টি প্রকৃতিগতভাবেই সবার শরীরে চলে আসে। সুতরাং এ নিয়ে অতিরিক্ত না ভেবে অন্যভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে যেমন: খেলাধুলা করে, বই ও খবরের কাগজ পড়ে, হাতের কাজ করে ইত্যাদি।

আবেগকে না বলা :

আমাদের ধর্ম ও সমাজে বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনোভাবেবই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা পরিস্থিতির চাপে এ রকম অবস্থায় পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখবে, আবেগকে 'না' বলতে জানাটাও বড় হওয়ার পূর্ব শর্ত। যদি কারো মনে হয়, তার বন্ধু বা প্রেমিক শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। তবে এ প্রস্তাবে সায় না দিয়ে অবশ্যই বড় কারো সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে। কখনই এ ধরনের বন্ধুর সঙ্গে একা কোথাও যাবে না।

পরিকল্পিত পরিবার গঠনের গুরুত্ব

সুন্দর ও পরিকল্পিত ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেকত ছেলেমেয়েরই বিয়ের আগে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা উচিত। এতে লজ্জার কিছু নেই। কারণ এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে কখন বাচ্চা নেওয়া উচিত, সে ব্যাপারে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

পরিবার পরিকল্পনা কী?

জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে পরিবার গঠন করাই হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। তবে সন্তান নেওয়ার আগে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে চিন্তা করবে, তারা কখন সন্তান নিতে চায় এবং সন্তান নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি তাদের আছে কি না। যেমন: কমপক্ষে ২০ বছর বয়স হওয়ার আগে মেয়েদের শরীরে মা হওয়ার মতো পূর্ণতা আসে না।

এ ছাড়া বিয়ের পর পরস্পরকে বোঝার ও জানার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। সন্তান হওয়ার পর তাকে আদরযত্ন দিয়ে বড় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং সন্তান লালন পালন করার মতো যথেষ্ট আয় রোজগার আছে কিনা, সেটাও ভেবে সন্তান নেওয়া উচিত। অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী পরিবার গঠন করা।

পরিবার পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন ?

- স্বামী-স্ত্রীর পছন্দমতো সময়ে এবং সীমিত সংখ্যায় সন্তান নিতে সাহায্য করে
- শিশু ও মায়ের জীবনের ঝুঁকি ও মৃত্যুর হার কমায়
- ঘন ঘন গভধারণ-সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস করে
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও যৌন্দর্য বাড়ায়
- স্বামী ও স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক চাপ কমায়
- পরিবারের সকলের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির সাহায্য করে
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সহমর্মিতা ও সমঝোতা বাড়ায়

তাহলে অবশ্যই জানা উচিত, কত বছর বয়সে বাচ্চা নেওয়া উচিত?

একজন মেয়ের ২০ বছর বয়সের পর বাচ্চা নেওয়া মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যদি এ বয়সের আগে কোনো মেয়ে গর্ভবর্তী হয়, তবে তার শারীরিক নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কারণ এ সময়ে মেয়েদের হাড পুরোপুরি বাড়ে না, তাই গর্ভবতী হলে পেটের বাচ্চা বেড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট জায়গা পায় না। ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম নেয়। আর এসব শিশুর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকে।

অল্প বয়সে প্রসবের রাস্তাটা ছোট থাকে তাই বাচ্চা হওয়ার সময় অতিরিক্ত চাপের ফলে এ রাস্তা ছিঁড়ে যায়। অনেক সময় বাচ্চা বের হতেও অনেক কষ্ট হয়। এ বয়সে মা হলে মা ও সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে।

এ ছাড়া অল্প বয়সে মেয়েরা মানসিকভাবে পুরোপুরি বড় হয় না। বাচ্চা যত্ন ও লালনপালন করে কীভাবে বড় করে তুলতে হয়, তা অল্পবয়সী মেয়েরা তেমন বুঝতে পারে না আর মা হওয়ার মতো দায়িত্ববোধ তৈরি হয় না।

পরিবার পরিকল্পনা কী, তা জনালাম। এবার জেনে নিই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কী?

পরিবারের সকলের জন্য ভালো স্বাস্থ্য, পরিবারের সবার মধ্যে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য পরিবার ছোট রাখা প্রয়োজন । আর পরিবার ছোট রাখার জন্য দরকার হয় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হচ্ছে জন্ম প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি যা অনাঙ্ক্ষিত গর্ভসঞ্চার এড়াতে সাহায্য করে। দেরিতে সন্তান চাইলে বা আর কোনো সন্তান না চাইলে বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করলে গর্ভধারণ হয় না। তাই বাচ্চার জন্ম হয় না।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে ?

প্রকারভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্নভাবে কাজ করে, যা ছেলেদের শুক্রাণুর সঙ্গে মেয়েদের ডিম্বাণুর মিলিত হওয়াকে বাধা দেয়। এর ফলে মেয়েদের গর্ভধারণ হয় না। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রকারভেদ :

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

১. আধুনিক পদ্ধতি
২. সনাতন পদ্ধতি

১.আধুনিক পদ্ধতি

আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দুই রকম: অস্থায়ী এবং স্থায়ী পদ্ধতি।

অস্থায়ী পদ্ধতি : যে পদ্ধতির ব্যবহার বন্ধ করে সন্তান চাইলে আবার গর্ভধারণ করা যায়।

- খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন-স্বল্পমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি
- ইমপ্ল্যান্ট ও আইইউডি (কপারটি) দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি
- ল্যাম (ল্যাকটেশনাল অ্যামনোরিয়া) বা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো পদ্ধতি

কনডম পুরুষের জন্য অস্থায়ী পদ্ধতি আর খাবার বড়ি, ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্ট ও আইইউডি (কপারটি) নারীদের জন্য অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি।

স্থায়ী পদ্ধতি : যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে বাচ্চা হওয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

স্থায়ী পদ্ধতিগুলো হলো:

- পুরুষের জন্য এনএসভি
- নারীদের জন্য লাইগেশন

এ পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের জন্য নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর সাহায্য নিতে হয়।

২.সনাতন বা প্রাকৃতিক পদ্ধতি:

যে পদ্ধতি গর্ভধারণ রোধে ঐতিহ্যগতভাবে সমাজে প্রচরিত আছে, সেগুলোকে সনাতন পদ্ধতি বলে। যেমন:

- প্রত্যাহার বা আযল
- নিরাপদকালে মেনে চলা
- নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত থাকা বা আত্মসংযম।

এত সব পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কীভাবে কোথা থেকে পাওয়া যায় সেগুলো জানা দরকার। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবা প্রাপ্তির স্থান সমূহ:

- পরিবার পরিকল্পনা কর্মী
- স্বাস্থ্যকর্মী
- কমিউনিটি ক্লিনিক
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহের মডেল ক্লিনিক
- জেলা হাসপাতাল
- এনজিও ক্লিনিক
- বেসরকারি ক্লিনিক

নববিবাহিতদের জন্য কোন পদ্ধতি ভালো ?

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেউ বাচ্চা নিতে না চাইলে অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, যেমন: খাবার বড়ি, কনডম ও ইমপ্ল্যান্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে এর মধ্যে যেকোনো একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়া যায়।

আমাদের সমাজে অনেক গুরুজন বিয়ের পরপরই নতুন বাচ্চার মুখ দেখতে চান। তাই নতুন বউকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেন না। অনেকে মনে করেন অন্তত একটি বাচ্চা হওয়ার আগে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা ঠিক নয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। নববিহাহিত দম্পতি বাচ্চা নিতে না চাইলে অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, যেমন: খাবার বড়ি, কনডম ও ইমপ্লান্ট ব্যবহার করতে পারেন।

কোন পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো ?

সব পদ্ধতি প্রজনন সক্ষম সকল স্বামী-স্ত্রীর জন্য সমানভাবে উপযোগী নয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের বা প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর পরামর্শ নিতে হবে। কারণ সব পদ্ধতি সবার জন্য মানানসই নাও হতে পারে। একেক পদ্ধতি একেকজনের শরীরের সঙ্গে মানিয়ে যায়। শরীরের সঙ্গে পদ্ধতির সমন্বয় না হলে বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো কোনটিতে দম্পতি সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং কোনটি গ্রহীতার স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ।

যৌন হয়রানি/নিপীড়ন এবং প্রতিরোধ

অনেক সময় কেউ কেউ রাস্তাঘাটে, বাসে বা অন্যান্য স্থানে ছেলেদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম অশোভন ও অস্বস্তিকর আচরণ, কথাবার্তা, মন্তব্য কিংবা শারীরিক স্পর্শের সম্মুখীন হয়ে থাকো, একেই বলে যৌন হয়রানি। নিজের যৌনবাসনা পূরণ করার জন্য কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করলে তাকে বলে যৌন নিপীড়ন।

বেশির ভাগ সময় নারী, বিশেষত শিশু ও কম বয়সী মেয়েরাই এ অবস্থার শিকার হয়ে থাকে। দেখা গেছে, পরিচিত লোকজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনই যৌন হয়রানি করে থাকে। সাধারণত যৌন হয়রানিকারী বা নিপীড়নকারীরা শিশু বা কম বয়সী ছেলেমেয়েদের ভয়, প্রলোভন, চাপ বা হুমকি দিয়ে এই ঘটনা কাউকে জানাতে নিষেধ করে। কিন্তু এ রকম হলে চুপচাপ না থেকে বা ভয় না পেয়ে অভিভাবক বা বড় কাউকে বলা উচিত এবং সেই সঙ্গে সমবয়সী ও পরিচিতদেরও তার সম্বন্ধে বলে দেওয়া উচিত যেন তারাও তার সম্বন্ধে সাবধান থাকতে পারে। মনে রাখবে যে যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন করে সে-ই দোষী, যাকে করা হয় তার কোন দোষ নেই।

সাধারণত উঠতি বয়সের ছেলেরা বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে মেয়েদের টিটকারি দিয়ে, উত্ত্যক্ত করে আনন্দ পায়। কারো কারো ক্ষেত্রে এটি অভ্যাসে পরিনত হয়। এটা মেয়েদের প্রতি ছেলেদের হেয় মনোভাবের প্রকাশ। এ ধরনের আচরণ মেয়েদের কখনো ভালো লাগে না, তারা এতে অস্বস্তি বোধ করে থাকে।

বিভিন্নভাবে একজন মানুষ যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার হতে পারেঃ

ক) শারীরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা জোর করে
খ) লোভ দেখিয়ে বা কোন ফাঁদে ফেলে অথবা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে
গ) কারো সরলতা বা অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে

এ ছাড়া অনেকে অনেক সময় মজা করার ছলে এমন কিছু আচরণ করে থাকে যা অন্যের প্রতি যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমরা অনেক সময়ই তা লক্ষ করি না।

যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের হাত থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করা যেতে পারে :

অনেকে অসচেতনতার জন্যে যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। **বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের বিশেষভাবে জনা প্রয়োজন যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের হাত থেকে কীভাবে নিজেক রক্ষা করতে পারেঃ**

- কখনো কোন অচেনা (নারী বা পুরুষ) লোকের সঙ্গে একা চলাফেরা না করা
- কাউকে ভালো লাগলেই চট করে তার সঙ্গে ভাব না করা
- আগ বাড়িয়ে কেউ সাহায্য বা উপকার করতে এলে ভেবে-চিন্তে তা গ্রহণ করা

- অচেনা কোন নারী বা পুরুষের সঙ্গে একা চলাফেরা না করা
- একা একা কারো সঙ্গে মেলামেশা না করে বা বেড়াতে না গিয়ে যত দূর সম্ভব দলবেঁধে চলাফেরা করা
- যৌন হয়রানি না নিপীড়ন করে এমন কারো সম্বন্ধে জানা থাকালে বা সন্দেহ থাকলে তার সঙ্গে একা না থাকা
- সমবয়সী কিংবা বয়সে বড় বিপরীত লিঙ্গের নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাবধান থাকা
- যে কেউ, সে যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হোক না কেন, শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠতা করতে চাইলে সাবধান হওয়া
- এসব ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা
- 'না' বলতে পারার দক্ষতা অর্জন ও সঠিক সময়ে তা প্রয়োগ করা
- বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে যৌন হয়রানকারী/নিপীড়নকারীর কথা জানিয়ে দেওয়া, যাতে সবাই তার কাছ থেকে সাবধানে থাকে।

অনেকে সম্মানের কথা ভেবে যৌন হয়রানির কথা গোপন করতে চায়, যা কিনা আরো বেশি বিপদ ঘটাতে পারে। অন্যদিকে আত্মসচেতন হয়ে, যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কী করা উচিত ?

- কেউ যৌন হয়রানি করতে চাইলে অন্যদের জানিয়ে দেবে বলে সাবধান করতে হবে
- বড় ভাইবোন অথবা মা-বাবাকে জানাতে হবে
- ওই ধরনের মানুষের সঙ্গে কখনো একা চলাফেরা করা যাবে না
- যৌন হয়রানিকারীর কোনো কথা বিশ্বাস করা যাবে না
- কেউ উত্ত্যক্ত করলে ভয় না পেয়ে ব্যক্তিত্ব বজায় মোকাবিলা করতে হবে
- উত্ত্যক্তকারী প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে মনে হলে অভিভাবককে জানাতে হবে এবং কৌশল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে
- কখনই নিজেকে দোষী হীনম্মন্য ভাবা যাবে না

অনেক সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক ছেলেমেয়ে মানসিকভাবে কষ্ট পায়। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক হতে পারে না। এমনকি অনেকের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা জেগে ওঠে। যদি কেউ এ রকম ঘটনার শিকার হয়, তবে এ অবস্থায় তাকে সান্তনা দিতে হবে, সমবেদনা জানাতে হবে-যেন সে এ অবস্থা থেকে নিজেকে সামলে নিতে পারে। কাউকে উত্ত্যক্ত করা এবং যৌন নিপীড়ন করা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ-অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। ছেলেমেয়েদের একে অপরের প্রতি সম্পান দেখানেই সাধারণ ভদ্রতা। সচেতনতা, আইনের প্রয়োগ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই ঘৃণ্য আচরণ থেকে মুক্ত হতে পারি।

জীবন দক্ষতার গুরুত্ব ও উপাদানসমূহ

সাধারণত: আমাদের দেশে কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা থাকে না। ফলে এ সময় স্বাস্থ্য তথা প্রজনন-স্বাস্থ্য হয়ে ওঠে ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে কিশোর কিশোরীরা সাধারণত:

- খুব আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল হয়
- জীবন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা কম থাকে
- নতুন কিছু করতে আগ্রহী থাকে
- যেকোনো নতুন বিষয় শিখতে-জানতে আগ্রহী থাকে
- তারা জানতে চায়, কেন শিখতে হয়, শিক্ষা কী কাজে আসে
- সমবয়সী এবং অন্যদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে চায়
- বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক পরিবেশে ভালোভাবে শেখে

কিশোর-কিশোরীদের আচরণের পরিবর্তন বা উন্নয়ন তখনই সহজ হয়ে ওঠে, যখন একটি অনুকূল পরিবেশে অর্জন করা জ্ঞানের আলোকে নিজেকে পরিচালিত করতে পারো। এ ক্ষেত্রে জীবন দক্ষতা কিশোর-কিশোরীদের আচরণ পরিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

জীবন দক্ষতা কী ?

জীবন দক্ষতা এমন একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া, উপাদানগুলো সঠিক ব্যবহার করে কিশোর-কিশোরীরা তাদের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত এবং দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারবে। জীবন দক্ষতা বলতে এমনকিছু মনোসামাজিক এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতাকে বোঝায়, যা কিশোর-কিশোরীকে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপখাওয়াতে, বিভিন্ন ইতিবাচক আচরণ তৈরিতে ও প্রতিদিনের ঝুঁকিসমূহকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। ফলে একজন কিশোর-কিশোরী সুস্থ, সবল ও উৎপাদনশীল জীবন গড়তে সক্ষম হয়।

ক. আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার অর্থ হলো মানুষের সঙ্গে সমাজের এবং সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক

খ. আর মনোসামাজিক দক্ষতা হলো এমন কিছু দক্ষতা, যা ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে টিকে থাকতে,খাপ খাওয়াতে, ঝুঁকি মোকাবিলা করতে এবং একে অপরের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে থাকে।

জীবন দক্ষতার উপাদানসমূহ :

জীবন দক্ষতা পালনে জীবন দক্ষতার পাঁচটি উপাদান জানা জরুরি:

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making)
   সমস্যা সমাধান (Problem solving)
২. ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা (Critical thinking)

সৃজনশীল চিন্তা (Creative thinking)

৩. কার্যকর যোগাযোগ(Communicaton)
আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক (Interpersonal relationship)

৪. আত্মসচেতনতা (Self awareness)
সমানুভূতি (Empathay)

৫. আবেগ ও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো (Coping with stress & emotion)

তাহলে চলো একে একে জেনে নিই সব বিষয়

১. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একই বিষয়ে অনেক বিকল্প পথ বের করা প্রয়োজন। ভালো ও মন্দ চিন্তা কওে যে সিদ্ধান্তে ভালো দিক বেশি, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা। জীবনের বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয়ে কী করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেই দক্ষতা অর্জন করা।
সমস্যা সমাধান : কোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে সমস্যাটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা। সমস্যার কারণ খোঁজা এবং সমাধঅন করতে পারার দক্ষতা অর্জন করা। সমস্যার সমাধান না কওে তা এড়িয়ে চললে মানসিক চাপ সৃষ্টি কওে, যার প্রভাবে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়।

২. **ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা :** বিশ্লেষণ চিন্তাচেতনা সমস্যা সমাধানে বিকল্প বা ভিন্ন পথ খুঁজতে সাহায্য করে।
সৃজনশীল চিন্তা : যার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করতে সাহায্য করে। এই দক্ষতা সমস্যার কারণ খুঁজতে এবং তার সমাধান পেতে সাহায্য করে।

৩. **কার্যকর যোগাযোগ :** নিজের চিন্তাভাবনা, ভালো লাগা-মন্দ লাগার বিষয়গুলো অন্যেও কাছে গ্রহণযোগ্য করে প্রকাশ করতে পারাই হলো কার্যকর যোগাযোগ। আন্তঃব্যক্তিক
সম্পর্ক : আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কী করে অন্যকে নিজের ভাবনা দ্বারা স্পর্শ করা যায়, সেই কৌশল শেখা।

৪. **আত্মসচেতনতা :** নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং যা জানি, তা নিয়মিত করা চর্চা করা।
সমানুভূতি : অন্যের অবস্থানে গিয়ে নিজেকে চিন্তা করতে পারার দক্ষতা ।

৫. **আবেগ ও চাপের সঙ্গে খাপ খায়ানো :**জীবনের আবেগময় বিষয়গুলো কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় এবং চাপের মুখে স্থির থেকে কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেই কৌশল শেখা।

মূলত জীবন দক্ষতা কিশোর-কিশোরীদের বেড়ে ওঠা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময়ে শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে কীভাবে সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে সঠিক ধারণা দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে তারা যা জানতে পারে তা হচ্ছে:

- আত্মসম্মান ও নিজ দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা
- পরিবার বন্ধুদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল সর্ম্পক সৃষ্টি

- সুস্থ জীবনধারণকে উৎসাহিত করা
- দৈনন্দিন জীবনের অশান্তি ও চাপ সহ্য করা
- আচরণের ক্ষেত্রে বিরোধিতামূলক প্রথা-আচার দূরীকরণ

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর বাইরে জীবনদক্ষতার প্রধান একটি ভূমিকা হচ্ছে, বিশেষ কিছু সমস্যা প্রতিরোধ, ঝুঁকি পরিহার এবং স্বাভাবিক উন্নয়নে নির্দিষ্ট বাধাসমূহকে দূর করা।

অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা প্রয়োজনীয় তথ্য সেবার অভাবে জীবনযাপনের সঠিক উপায়টি বেছে নিতে ভুল করে। বিশেষ করে কিশোরীদের এ সমস্যাটি আরো প্রকট। প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন সামাজিক, স্বাস্থ্যগত আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই কিশোর-কিশোরীরাই বর্তমান ভবিষ্যতের সম্পদ। তাদের স্বাস্থ্য, বিশেষ করে প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য এবং এর নিরাপত্তার অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা জরুরি।

কিশোর-কিশোরীরা দেশ ও সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রজনন-স্বাস্থ্যসম্পর্কিত ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। আর এসব ঝুঁকি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাদের সঠিক তথ্য, নিরপেক্ষ পরামর্শ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সেবা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে একমাত্র জীবন দক্ষতা তাদের সঠিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে। সুতরাং জীবনদক্ষতা হলো সেই মাধ্যম, যার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

আমাদের কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেসব মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন, সেগুলো হলো:

- মাদকসেবন
- কিশোর বয়সে গর্ভধারণ
- যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ
- দুর্ঘটনার শিকার
- অবসাদ ও উদ্বিগ্নতা
- পীড়ন ও সহিংসতা
- আত্মহত্যা
- জেন্ডার-বৈষম্য
- স্কুল থেকে ঝরে পড়া
- এইচআইভি ও এইডস
- এসটিআই
- কিশোর অপরাধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া ও সচেতনতা বৃদ্ধি

জীবন দক্ষতা কিশোর-কিশোরীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরিবারে, আশপাশের অভিভাবক ও বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দরজা খুলে দেয়। মনে রাখতে হবে, এসব বিষয়য়ে কিশোর-কিশোরীদের জানার আগ্রহ ও কৌতূহলের অবসান ঘটানো পরিবার ও সমাজেরই দায়িত্ব। তাই এ ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হচ্ছে পরিবারের মা-বাবা, বড় ভাইবোন বা অন্য কোনো সদস্য, বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু অথবা এলাকার একজন স্বাস্থ্যকর্মী। বিভিন্ন সরকারি ও এনজিও পরিচালিত কার্যক্রমে কিশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শের সুযোগ রয়েছে। এসব কার্যক্রম থেকেও কিশোর-কিশোরীরা জীবনদক্ষতার বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারে, যা তাদের উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

ধূমপান এবং মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার

বয়ঃসন্ধিকাল কৌতুহলের সময়। কৈশোরে অনেকেই কৌতূহলবশত আবার কেউ কেউ বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, কেউ আবার বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে ধূমপান শুরু করে। সিগারেট, বিড়ি বা হুক্কার মাধ্যমে শরীরের ভেতর ধোঁয়া টেনে নেওয়াকে ধূমপান বলে। কিশোর বয়সে ধূমপান করে নিজেকে বড় ভাবতে ভালো লাগে। আর এভাবে একবার ধূমপান শুরু করার পর ধীরে ধীরে তা নেশায় পরিণত হয়। বাংলাদেশে কিশোরদের মধ্যে ধূমপানের পাশাপাশি মাদক গ্রহণের হার খুব দ্রুত বেড়ে চলছে। এই আসক্তি তাদের জীবনকে করে তুলছে দুর্বিষহ। বিভিন্ন রোগ, অকালমৃত্যু কর্মক্ষমতা লোপ এবং দুঃখ-দুর্দশার অন্যতম কারণ ধূমপান। একজন সচেতন কিশোরী হিসেবে সুস্থ ও সুন্দর একটি সমাজ গঠনে ধূমপান ও মাদকের ক্ষতিকর আসক্তি বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠা, বন্ধুবান্ধব ও সমাজকে সচেতন করে তোলা আমাদের দায়িত্ব।

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব :

সিগারেট বা বিড়ির ধোঁয়া যে খায়, সেটা তার জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি তার চারপাশে যারা থাকে তাদের জন্যও সমান ক্ষতিকর। অনেকে বন্ধ ঘরে সিগারেট বা বিড়ি খায়, তখন দেখা যায়, এতে মাথা ঝিম ঝিম করে, শরীর খারাপ লাগে। সিগারেট বা বিড়ির তামাকের মধ্যে নানা রকম বিষাক্ত জিনিস থাকে, যা আমাদের শরীরকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে ফেলে। সামান্য পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠা, বুক জ্বালাপোড়া করা ইত্যাদি ধূমপানের জন্যই হয়। শরীররের ওপর ধূমপানের প্রভাবে যেসব রোগ হয়ে থকে, সেগুলো হলো ক্ষুধামন্দা, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, কাশি, হাঁচি, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া, শ্বাসনালির ক্যানসার, খাদ্যনালির ক্যানসার, ফুসফুসের ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ, রক্তানালির রোগ, গর্ভাবস্থায় শিশুর বৃদ্ধি কমে যাওয়া, কম ওজনের শিশুর জন্ম, পাকস্থলীর ক্যানসার ইত্যাদি। এ ছাড়া ধূমপান স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসকে বিঘ্নিত করে এবং হৃদ্‌স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। আর পাকস্থলীতে বেশি বেশি এসিড নিঃসরণের ফলে পাকস্থলীতে ক্ষত তৈরি করে।

অধূমপায়ীদের ওপর ধূমপানের প্রভাব :

অনেকে মনে করে কেবল যারা ধূমপান করে, তারাই ধূমপান-সংক্রান্ত সমস্যায় পড়ে। আসলে তা নয়। অধূমপায়ীর সামনে ধূমপান করলে তার ওপরও এর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে শিশুর এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধূমপায়ীদের ওপর ধূমপানের ধোঁয়ার কারণে যেসব প্রভাব পড়তে পারে, তা হলো:

- ব্রংকাইটিস
- শিশুদের কানের অসুখ
- শিশুদের কাশি, হাঁচি এবং যাদের হাঁপানি আছে, তাদের হাঁপানি বেড়ে যাওয়া
- গর্ভাবস্থায় মা ধূমপান করলে শিশুর রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা কমে যায়
- হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ নিয়ে কিংবা বিকলাঙ্গ হয়ে শিশুর জন্য নেওয়া
- সময়ের আগেই শিশুর জন্ম নেওয়া

পরিবেশ ও সমাজের ওপর ধূমপানের প্রভাব :

ধূমপান পরিবেশে ও সমাজের জন্যও ক্ষতি বয়ে আনে। একজন ধূমপায়ী নিজের ক্ষতির পাশাপাশি তামাকের ধোঁয়ার তার চারপাশের পরিবেশের জন্যও সমান ক্ষতি বয়ে আনে।

জানা প্রয়োজন ধূমপান বা তামাক প্রতিরোধের উপায়

ধুমপান থেকে ছেলেমেয়েদের বিরত রাখার জন্য পরিবারের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। বাড়ির লোকেরা নিজেদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, মায়ামমতা, নৈতিক গুণাবলি, সুন্দর জীবনের গল্প বলে কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ বিকাশের পথ দেখাতে পারে। তবে এসব করার জন্য মা-বাবাকে অবশ্যই সন্তানদের পড়াশোনায় সাহায্য করা, সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা, লাইব্রেরি করা ইত্যাদি মহৎ কাজে উৎসাহ দিতে হবে। অন্যথায়:

- পরিবারে ধূমপান বন্ধ করতে হবে
- পরিবারের কেউ ধূমপান করলে তাকে এর খারাপ দিকগুলো বোঝাতে হবে
- খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং উন্নয়নমূলক কাজ করার উৎসাহ দিতে হবে
- ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে
- ধূমপান-বিরোধী প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে
- ধূমপায়ীদের ধূমপানের বিরুদ্ধে সচেতন করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে ধূমপান করা ছাড়ার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট
- আনন্দ করার জন্য কিংবা ক্লান্তি দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় বের করে দিতে হবে
- ধূমপান-বিরোধী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে
- নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে

মনে রাখবে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সদিচ্ছা এবং সচেতনতাই ধূমপান প্রতিরোধের অন্যতম উপায় ।

মাদকাসক্তি কী ?

মাদকদ্রব্য বলতে আমরা বুঝি এমন দ্রব্য, যা খেলে নেশা হয়। এগুলো হলো গাঁজা, ফেনসিডিল, চরস, ভাঙ, গুল, জর্দা, হেরোইন, পেথিডিন, মদ ইত্যাদি। যখনই কোনো বক্তি এসব দ্রব্যের প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট এবং আস্তে আস্তে আসক্ত হয়ে পড়ে, তখনই তাকে মাদকাসক্ত বলা হয়।

কিশোর-কিশোরীরা নেশাগ্রস্ত হয় সাধারণত নিম্নোক্ত কারণে

- বন্ধুবান্ধব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে
- কৌতূহলবশত

- স্মার্টনেস প্রদর্শনের জন্য
- হতাশার বশবর্তী হয়ে

যা কিশোর-কিশোরীদের মাদক গ্রহণে উৎসাহিত করে তোলে।

মাদকাসক্তির কুফল বা ক্ষতিকর দিকগুলো কী ?

মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অনেকেরই সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। ফলে নিজের অজান্তেই অনেকে মাদকের মতো সর্বনাশা নেশায় জড়িয়ে পড়ে। অনেকেই মাদকের জন্য বাসা থেকে অর্থ জোগাড় করতে পারে না। আর যখন নেশা ওঠে, তখন সে নেশার জিনিস কেনার জন্য চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ করতে পারে। ফলে পরিবার ও সমাজের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। মাদকদ্রব্য শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি দিক থেকে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ওপর মাদকদ্রব্যের সাধারণত যেসব প্রভাব পড়ে থাকে, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি

- শেখার ক্ষমতা ও কাজের দক্ষতা কমিয়ে দেয়
- আবেগকে নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলে
- সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়
- মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়
- উগ্র আচরণের জন্ম দেয়
- আত্মহত্যার প্রবণতার জন্ম দেয়

শারীরিক ক্ষতি

- মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে মেরে ফেলে
- খেলাধূলায় দক্ষতা কমিয়ে দেয়
- শারীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তারতম্য ঘটায়
- শরীরের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কমিয়ে দেয়
- স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে
- অন্ত্র থেকে ভিটামিন শোষণে বাধা দেয়
- যৌনক্ষমতা হ্রাস পায়
- লিভার সিরোসিসেস কারণ হতে পারে
- হৃদ্‌রোগেরজন্ম দিতে পারে

- কিডনি নষ্ট করে ফেলতে পারে
- স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়
- রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়
- এইডস হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়

সামাজিক ক্ষতি

- কার্যকর যোগাযোগের ক্ষমতা হ্রাস করে
- অনর্থক তর্ক করার প্রবণতা তৈরি করে
- আঘাত করার প্রবণতা তৈরি করে
- পরনির্ভর করে ফেলে
- পারিপার্শ্বিক জড়ৎ সম্পর্কে অসতর্ক করে ফেলে ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

অর্থনৈতিক ক্ষতি

- কাজে (স্কুলে) ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে
- স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কারণে খরচ বেড়ে যায়
- নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য এবং অপরাধ বেড়ে যায় বলে রাষ্ট্রের খরচ বেড়ে যায়
- কর্মক্ষম জনশক্তি হ্রাস পায়

মাদকাসক্তির প্রতিরোধ এবং এর প্রতিকার কীভাবে সম্ভব ?

মাদক আমাদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। মাদকদ্রব্যের ব্যবহারের সঙ্গে যেন ছেলেমেয়েরা জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য তাদের প্রতি পরিবারের সদস্যদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। মা-বাবাকে নিজেদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, আদর-স্নেহ, নিজেদের নৈতিক গুণাবলি দিয়ে সন্তানকে সুস্থ বিকাশের পথ দেখাতে হবে। পাশাপাশি আমাদের দায়িত্ব মাদকের বিরুদ্ধে বন্ধুবান্ধবকে সচেতন করে তোলা। তা ছাড়া নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে :

- পরিবারের কেউ নেশা করলে তাকে এর খারাপ দিকগুলো বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতে হবে
- খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং উন্নয়নমূলক কাজ করার উৎসাহ দিতে হবে
- তাদের বোঝাতে হবে, মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ করার জন্য নিজের ইচ্ছাই যথেষ্ট
- আনন্দ করার জন্য, ক্লান্তি দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় খুঁজে দিতে হবে

সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে

- সমাজে মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধে সামাজিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে
- মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সুস্থ করে সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা
- মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধ করা
- নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো

পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষা ও সঠিক উদ্যোগ বন্ধু নির্বাচন, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পথ।

শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের নিয়ম ও গুরুত্ব

শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনেক। ব্যায়াম শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং ফটনেস বাড়ায়। এ প্রসঙ্গে একটি নীতিবাক্য রয়েছে, 'সুস্থ দেহ মানে সুস্থ জীবন।' আর এই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিয়মিত শরীর চর্চা করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে কিশোর-কিশোরী ও শিশুর ঘরে বসে টেলিভিশন ও কম্পিউটারের মাঝে বেশি সময় কাটায়। ফলে তাদের স্বাভাবিক শারীরিক পরিশ্রম কম হয়। এতে তাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও কমে যায়। মনে রাখবে, সুস্থভাবে জীবনযাপন করা বা বেঁচে থাকার জন্য নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্লতার জন্য যথাযথ ব্যায়াম অত্যাবশ্যক। আর এ ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছাটাই প্রধান। সুতরাং সেদিকে খেয়াল রেখে নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করা উচিত।

নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা

নিয়মিত ব্যায়াম শরীরকে সার্বিকভাবে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

- শারীরিক শক্তি ও ফিটনেস বাড়ায়
- শরীরে মেদ জমে না, ওজন কমাতে সহায়তা করে
- আত্মসচেতনতা ও সহানুভূতি
- মানসিক অস্থিরতা কমায় এবং মন প্রফুল্ল রাখে
- মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি বাড়ায়
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ায়
- হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায়
- হজমশক্তি বাড়ায়
- হাড় মজবুত হয় ও ক্ষয়িষ্ণুতা হ্রাস করে
- গভীর ও প্রান্তির ঘুম নিশ্চিত করে

শরীর চর্চা বা ব্যায়ামের নিয়মকানুন

প্রতিটি কাজেরই সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন সঠিক নিয়ম থাকা দরকার, তেমনি ব্যায়ামেরও অনেক নিয়মকানুন আছে। এগুলো জেনে বুঝে করা প্রয়োজন। অনেক সময় খালি হাতে হালকা ব্যায়াম করে। আবার অনেক সময় কিছু ভারী ব্যায়ামও করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম পেশির গঠন মজবুত করে।

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যায়াম করা জরুরি। কিশোর-কিশোরীদের জন্য কিছু ব্যায়াম সপ্তাহে ২-৩ বার ২০ থেকে ৩০ মিনিট করে করা উচিত। সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো, দড়ি টানাটানি ইত্যাদি ব্যায়াম পেশি

মজবুত করতে সাহায্য করে। আবার পা মজবুত করতে প্রয়োজন দৌড়াদৌড়ি, সাইকেল চালানো ইত্যাদি ব্যায়াম। নিচে ব্যায়ামের কিছু সাধারণত নিয়মকানুন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ব্যায়ামের প্রস্তুতি :

- কেন ব্যায়াম করা দরকার, সটা আগে পরিষ্কার হতে হবে। স্বাভাবিক ওজনের কিশোরীদের ফিট থাকার জন্য সপ্তাহে অন্তত ৪-৫ দিন ৩০ মিনিট করে ব্যায়াম করতে হবে। আবার ওজন কমাতে হলে ৯০ মিনিট ব্যায়াম করতে হবে।

ব্যায়ামের সময় করণীয় :

- ব্যায়ামের সময় আরামদায়ক পোশাক ও কেড্স পরার পাশাপাশি তোয়ালে ও পানির বোতল রাখা ভালো
- Dehydration থেকে রক্ষা পেতে একটু পরপর পানি খেতে হবে
- শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে ব্যায়ামের সময় অথবা বিশ্রামের সময় শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হবে
- ব্যায়ামের সময় সম্পূর্ণ শরীরটাকে কাজে লাগাতে হবে, যেমন: হাঁটার বা দৌড়ানোর সময়
- মাসিক চলাকালীন সময়েও নিয়মিত ব্যায়াম করা যাবে।

ব্যায়ামের রুটিন :

- নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।
- একটি নির্দিষ্ট রুটিন মেনে কোন দিন, কোন ব্যায়াম কতটুকু করতে হবে, তা আগে থেকেই ঠিক করে মেনে চলতে হবে।
- প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করতে হবে।
- মাঝে মাঝে ব্যায়ামের রুটিন পরিবর্তন করা ভালো। কারণ একই ধরনের ব্যায়ামে শরীর অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা কাজে লাগবে না।
- সপ্তাহে একদিন শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

ব্যায়ামের সতর্কতা :

অতিরিক্ত কোনোকিছুই ভালো না। অতিরিক্ত ব্যায়ামেরও ঝুঁকি আছে। তাই শরীরচর্চা ব্যায়াামের সময় কতগুলো বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যেমন:

- শারীরিক ক্ষমতা, গঠন ও বয়স অনুয়ায়ী ব্যায়াম করতে হবে।
- ব্যায়াম করার সময় একবারে বেশি পানি খাওয়া যাবে না। তাহলে রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ কমে যেতে পারে।
- ওয়ার্ম আপ আর কুল ডাউন ব্যায়ামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ওয়ার্ম আপ বলতে শরীর ও মাসেলের তাপমাত্রা এবং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধিকে বোঝায়। প্রথমে ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করে ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে তারপর জগিং করতে হবে। এভাবে যখন শরীর গরম হবে, তখন বোঝা যাবে ওয়ার্ম আপ হয়েছে।

- ব্যায়ামের ঠিক আগে ও পরে খাওয়া যাবে না। তাহলে হজম সমস্যা হবে না। আবার একেবারে কিছু না খেয়ে অথবা সারা দিন না খেয়েও ব্যায়াম করা ঠিক নয়। এতে শক্তি পাওয়া যায় না। ব্যায়াম শেষ করার ১৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর খাওয়া উচিত।
- ব্যায়ামের সময় মেরুদণ্ড সোজা, মুখ সামনের দিকে সোজা রেখে ব্যায়াম করতে হবে।
- ব্যায়াম করতে করতে ক্লান্তি লাগলে অথবা খারাপ লাগলে জোর করে ব্যায়াম না করে বন্ধ করে দিতে হবে। ব্যায়াম করতে হবে আনন্দের সঙ্গে।

ব্যায়ামের সময় খাদ্যভ্যাস

- শরীরচর্চার অনেক বেশি ফলাফল পেতে হলে প্রচুর তরলজাতীয় খাবার খাওয়া প্রয়োজন। কাজেই ব্যায়াম বা খেলাধুলা করার আগে, মাঝে ও শেষে যথেষ্ট পরিমানে পানি পান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফ্রুট ড্রিংকস বা পানি পান করা ভালো।
- আবার ব্যায়াম করলে শরীর থেকে এনার্জি ক্ষয় হয়। এর ফলে শরীর দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তা থেকে রক্ষা পেতে দরকার হয় কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাবার গ্রহণ। আর সে জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রুটি, সবজি ও ফল খাওয়া জরুরি।
- এ ছাড়া ব্যায়ামের সময় শরীর থেকে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম বের হয়ে যায়। যার জন্য পটাশিয়াম-সমৃদ্ধ ফল ও সবজি খাওয়া প্রয়োজন। যেমন: কলা, টম্যাটো, কমলা ও নানা দেশি ফল। অন্যদিকে সোডিয়ামের অভাব দূর করতে ফলগুলোকে হালকা লবণ দিয়ে খেলেই ব্যায়ামের সময় শরীর থেকে যে সোডিয়াম বের হয়ে যায়, তা পূরণ হয়ে যাবে।

কিশোরী বয়সে সুস্থ থাকার উপায়

সুস্থতা আমাদের সবার কাম্য। সুস্থ থাকার জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হবে:

- পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে
- পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে
- খাওয়ার পরপর ব্যায়াম করা যাবে না
- প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে
- প্রতিদিন কিছুটা সময় হাসিখুশি থাকতে হবে

একমাত্র ব্যায়াম বা শরীরচর্চাই পারে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দিতে। তাই ব্যায়াম যেন জীবনের শুরু থেকে সব কিশোর-কিশোরীরই দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়, সেই চেষ্টা করা উচিত।

কিশোর-কিশোরী ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময় হচ্ছে কৈশোরকাল। কিন্তু এ সময়েই আমাদের দেশের অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী প্রধান দুটি প্রতিবন্ধকতা-দারিদ্র ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়।

কিশোর-কিশোরীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কী?

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর এবং কিশোর-কিশোরীদের অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন যেকোনো কাজই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ১০-১৪ বছরের কিশোর-কিশোরীদের ১৮ শতাংশ এবং ১৫-১৯ বছরের কিশোর-কিশোরীদের ৫৭ শতাংশই কর্মজীবী। তবে উভয় বয়সসীমার ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে কর্মজীবী কিশোর-কিশোরীদের শতকরা হার বেশি। আর এ ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েদের কাজের ধরন ও প্রকৃতিতেও রয়েছে পার্থক্য। মেয়েদের কাজের ধরন ছেলেদের থেকে কিছুটা পার্থক্য হলেও তাও কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়। দেখা যায়, গ্রাম থেকে আসা বেশির ভাগ মেয়েরা প্রধানত বিভিন্ন বাসাবাড়ি ও পোশাকশিল্পের কাজ করে থাকে। নিচে তাদের কিছু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের উল্লেখ করা হলো :

- গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত
- পোশাকশিল্পে নিয়োজিত
- নির্মাণ ও ইটভাঙার কাজে নিয়োজিত
- সড়কে ফুল, চকলেটসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির কাজে নিয়োজিত
- বিভিন্ন পরিবহনে লিফলেট বিতরণের কাজে নিয়োজিত
- মাদকদ্রব্য সরবরাহ ও বিক্রয় কাজে নিয়োজিত

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের ফলে কী কী শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয় ?

সাধারণভাবে এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ফলে কিশোর-কিশোরীরা নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে। কিশোরী মেয়েরা সাধারণত যেসব ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে:

- স্বাভাবিক শৈশব ও পারিবারিক জীবন নষ্ট হয়
- স্বাস্থ্য ভেঙে পরা
- শিক্ষা ব্যাহত হওয়া
- অল্প বয়সে শ্রম-উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ফলেপরিণত বয়সে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া
- কর্মস্থলে হয়রানি
- পাচার

- যৌন হয়রানি
- ধর্ষণ
- পতিতাবৃত্তি
- অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ
- বিভিন্ন যৌনবাহিত সংক্রামক রোগ
- এইচআইভি সংক্রমণ
- সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ করে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়া

তাহলে অবশ্যই জানা উচিত ক্ষতির পরিমাণ ও ভয়াবহতা

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের ফলে কিশোর-কিশোরীরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে যেসব ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে, তার পরিমাণও কিন্তু কম নয় ।

- ইউনিসেফের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়, আমদের দেশের যেসব মেয়ে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, তাদের গড় বয়স ১১.৬ বছর।
- আবার গৃহকর্মে নিয়োজিত মেয়েদের প্রায় ২৫ শতাংশ ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে।
- যারা এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে, তাদের অধিকাংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। প্রতিবছর গড়ে ২৫০ টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে।
- এমনকি ১৩-১৯ বছরের মেয়েরা প্রতিনিয়ত পাচার হচ্ছে।
- জানা যায়, প্রায় ৩ লাখ মেয়ে ভারতের বিভিন্ন পতিতালয়ে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে গত ১০ বছরে ২ লাখ নারী পাকিস্তানে পাচার হয়েছে।

বাসাবাড়িতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিশোরী শ্রমিকেরা অহরহ এ জাতীয় অবস্থার মুখোমুখি হয়। মুলত এসব তথ্য ঘটনার ভয়াবহতারই ইঙ্গিত বহন করে।

কৈশোর বয়সে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের কারণ

- দরিদ্রতা
- ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা না থাকা
- বিকল্প কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা না থাকা
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা

- কন্যাশিশুর প্রতি সামজিক বৈষম্য

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম প্রতিরোধে করণীয়

সুতরাং আমাদের সমাজের কিশোর-কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে বিরত রাখতে আমাদের যা করতে হবে:

- যোগ্যতা ও ঝোঁক অনুসারে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে
- তাদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম অবসানের জন্য আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- বিভিন্ন পেশায় নিয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট নিয়োগদাতার শ্রম আইন যথাযথভাবে মেনে চলা
- স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডের মাধ্যমে বিশেষ বয়সী ছেলেমেয়েদের তালিকা করে তাদের নিরাপত্তার ওপর নজর রাখা
- সরকারিভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে এদের নিরাপত্তা জোরদার করা
- শ্রম অধিকার সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা

সবশেষে বলা যায় যে, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর এবং তাদের প্রয়োজন ও অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন যেকোনো কাজই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম। সুতরাং এ-বয়সী ছেলেমেয়েদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক দিকসহ সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য যেকোনো ধরনের উৎপাদনশীল শিক্ষা ও কাজের প্রতি সবার দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরী দেশের গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী, এ জন্য কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্দ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় নিশ্চিত করা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।